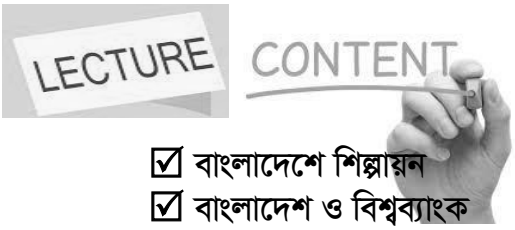


- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি
- ☑ বাংলাদেশের বাণিজ্য ও রপ্তানি
- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান
- ☑ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ
- ☑ বাংলাদেশে শিল্পায়ন
- ☑ বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক
- ☑ বাংলাদেশ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
- ☑ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন

## Syllabus on Bangladesh Affairs

- **Globalization and Bangladesh:** Economic and Political Dimensions; Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners and Multi National Corporations (MNCs).
- Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation, Vision- 2021, GNP, NNP, GDP etc. after the emergence of the country.

## BCS প্রশ্নাবলী — বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র

- ইপিজেড (EPZ) কীভাবে বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? *(৪০তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (BEPZ) মধ্যে পার্থক্য কী? *(৪০তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিখাতের ভূমিকা আলোচনা করুন। *(৪০তম বিসিএস)*
- টীকা লিখুন : পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি (Green Economy) *(৪০তম বিসিএস)*
- আমাদের খনিজ সম্পদ আহরণ ও শিল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কি বুঝায়? *(৩৭তম বিসিএস)*
- দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। *(৩৭তম বিসিএস)*
- টীকা লিখুন : *(৩৭তম বিসিএস)*
  - ক. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)
  - খ. বাংলাদেশে IMF এর কার্যক্রম

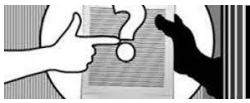

## যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বর্ণনা দিন।
৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।
৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের গুরুত্ব আলোচনা পূর্বক বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।
৭. সাম্প্রতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
৮. বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখপূর্বক কিভাবে এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন।
৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
১০. বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করুন।

## STUDENT STUDY বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি। অর্থনীতির সকল খাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী খাতকে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারী খাতের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। তবে কিছু ক্ষেত্রে সরকারী খাতের সীমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি নিচে উল্লেখ করা হল-

ক) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি জমির ক্ষেত্রে, সম্পত্তির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা-বানিজ্য ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শিল্প স্থাপন, ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি সরকারী নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, বাজারে নির্দিষ্ট গুণগত মানের দ্রব্য বিক্রয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন। এ ছাড়া বেআইনী পেশা গ্রহণের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে।

গ) বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে কোন কোন পণ্যের বাজার সরকারী হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন, ধান কাটার মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহ, বেশি দামের সময় খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রয়, ঘাটতির সময় চাল আমদানি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। তবে ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের গুরুত্ব হ্রাস পায়। বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল কাজ পরিচালিত হলেও শিল্পখাত, আর্থিক খাত, যোগাযোগ ও পরিবহন খাত, খনিজ ও জ্বালানী খাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত রয়েছে। শিল্প আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ৬টি ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য সকল শিল্প ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ঙ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় খাত গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চ) যে সকল ব্যক্তি বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে না বা অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না বাজার অর্থনীতিতে তাদের কল্যাণ হয় না। এসব বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করে। যেমন, দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ডি,জি,ডি কর্মসূচী ইত্যাদি।

ছ) অর্থনীতিতে কোন দুর্যোগ বা সঙ্কট দেখা দিলে সরকার তা মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাধি ইত্যাদির প্রকোপ লাঘবের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোন বাজারে যোগানের স্বল্পতার জন্য বা ফটকাবাজির জন্য অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## CLASS WORK বাংলাদেশের বাণিজ্য

বাংলাদেশ একটি মুক্ত অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতির জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। আবার বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক কিছু প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে। আমরা বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা, বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব। বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

ক. **বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি। ফলে তার বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়। তবে আমাদের আমদানির বেশির ভাগ হচ্ছে মূলধনী দ্রব্য, মাধ্যমিক পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল যা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

খ. **বাণিজ্য শর্তের উঠানামা ঃ** রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের অনুপাতকে বাণিজ্য শর্ত বলে। বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত স্থির নয়, প্রায় প্রতি বছরই উঠানামা করে। বাণিজ্য শর্তের উঠানামার ফলে রপ্তানির ক্রয় ক্ষমতা উঠানামা করে।

গ. **মুষ্ঠিমেয় রপ্তানি দ্রব্য ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি দ্রব্যের মধ্যে কেন্দ্রভূত। তৈরি পোশাক, হোসিয়ারী দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়েত খাদ্য ও চামড়া থেকে রপ্তানি আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ আসে। গিনি কেন্দ্রীভবন অনুপাত থেকে দেখা যায় রপ্তানির এই কেন্দ্রীয় ভবন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. **গুটি কয়েক দেশে রপ্তানি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর ভৌগলিক কেন্দ্রীভবন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় সংঘভুক্ত উন্নত দেশগুলোতে রপ্তানির সিংহ ভাগ যায়।

ঙ. **রপ্তানি বাণিজ্যের গঠন ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এতে প্রাথমিক পণ্যের অংশ কম এবং শিল্পজাত পণ্যের অংশ বেশি।

চ. **সার্কভূক্ত দেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য ঃ** সার্কভূক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ খুব কম। এসব দেশে থেকে আমদানির পরিমাণ বেশি। বিশেষতঃ বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে যে সব পণ্য আসে তার পরিমাণও খুব বেশি।

ছ. **আমদানির গঠন ঃ** বাংলাদেশের আমদানির মধ্যে ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ কম এবং মূলধনী পণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল-এর পরিমাণ বেশি। প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য-তৈরি পোশাক ও নীট ওয়ার-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সুতা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জ. **জনশক্তি রপ্তানি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসে জনশক্তি রপ্তানি থেকে।

ঝ. **ব্যক্তিগত খাতের গুরুত্ব ঃ** বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

ঞ. **রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন ঃ** আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার-এর উৎপাদনের জন্য মূলধনী দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকাংশই আমদানি করা হয়। এজন্য রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কম। এই শিল্পের সঙ্গে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী সংযুক্ত শিল্পের উন্নতি করে এ সমস্যা হ্রাস করা যায়।

➘ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হল-

ক. **বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস ঃ** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেশি। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। জি,ডি,পি-এর শতকরা অংশ হিসেবে এই ঘাটতির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে।

খ. **বাণিজ্য শর্তের নিম্নগতি ঃ** বাণিজ্যশর্তের প্রবণতায় সামান্য নিম্নগতি দেখা যায়। বাণিজ্য শর্তের এই প্রবণতার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ১ একক রপ্তানি ক্রমান্বয়ে কম পরিমাণ আমদানি ক্রয় করতে সক্ষম।

গ. **রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্তন ঃ** রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমতঃ ১৯৭০ এর দশক এবং ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রপ্তানি বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এ পণ্য দুটোর গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশঃ তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী খাতের, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের এবং পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানকালে তা নেই। এর পরিবর্তে বর্তমানকালে ব্যক্তিগত খাতের এবং উত্তর আমেরিকার ও ইউরোপীয় সংঘভূক্ত দেশগুলোর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয়তঃ রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষিজাত পণ্যের পরিবর্তে শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. **আমদানি বাণিজ্যে পরিবর্তন ঃ** পূর্বে বিশেষতঃ ১৯৭০-এর দশকে আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য শস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। তবে কোন বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্য উৎপাদন কম হলে ঐ বছর সাময়িকভাবে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে খাদ্যসহ ভোগ্যপণ্য আমদানির বড় অংশ জুড়ে থাকত। কিন্তু বর্তমানে মূলধনী দ্রব্য ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ. **জনশক্তি রপ্তানি ঃ** জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে পূর্বে রেমিট্যান্স এর অর্থের বেশির ভাগ যুক্তরাজ্য থেকে আসত। এখন বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বেশিরভাগ আয় আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে।

চ. **সার্কভুক্ত দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি ঃ** বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষত বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের বিশেষত ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ভারসাম্যে বিরাট ঘাটতি রয়েছে। তবে এই ঘাটতির একটি বড় কারণ হচ্ছে ভারত থেকে শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি।

CLASS WORK

# বাংলাদেশের রপ্তানি

বাংলাদেশের রপ্তানি মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এই পণ্যগুলো দুভাগে ভাগ করা যায় যেমন, প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য। নিচে কয়েকটি প্রধান রপ্তানি পণ্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

## ➘ প্রাথমিক পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাথমিক পণ্যসমূহ রপ্তানি করে মোট ১,৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানি আয়ের ৩.৯১ ভাগ ছিল। প্রাথমিক পণ্যসমূহের মধ্যে কাঁচা পাট, চা ও হিমায়িত খাদ্য প্রধান। উক্ত বছরে এই তিনটি পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিচে এই তিনটি রপ্তানি পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল-

ক. **কাঁচা পাট:** পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল। ১৯৭০-এর দশকে পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে বর্তমানে পাটের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং সে সঙ্গে বাংলাদেশের পাট রপ্তানির পরিমাণও পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। দেশে পাটের তুলনায় ধানের চাষ অধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় পাট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বিকল্প পেট্রোলজাত কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার প্রসার লাভ করায় পাটের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু কাঁচা পাট দেশের পাট শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কাঁচাপাটের পরিমাণ হ্রাস পায়। যাহোক অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কাঁচা পাট থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কাঁচা পাটের বাজারে অস্থিতিশীলতার জন্য কাঁচা পাট থেকে রপ্তানি আয় ব্যাপকভাবে উঠানামা করে।

খ. **চা:** চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। দেশে চায়ের উৎপাদনে উঠানামা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের জন্য চা রপ্তানিতে হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে চা রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গ. **হিমায়িত খাদ্য:** হিমায়িত খাদ্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি অপ্রচলিত পণ্য। কিন্তু এই পণ্যটি থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এই পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

## ➘ শিল্পজাত পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ স্বল্প সংখ্যক শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এদের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিল্পজাত পণ্যসমূহ থেকে মোট ৩২,৩৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়। যা মোট রপ্তানি আয়ের ৯৬.০৯%। নিচে প্রধান প্রধান শিল্পজাত রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

ক. **পাটজাত পণ্য:** ১৯৭০-এর দশক এবং ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। দেশে যোগান সংক্রান্ত অসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার, পরিবহন ও প্যাকেজিং শিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ইত্যাদি কারণে চাহিদা হ্রাস: এই উভয় প্রকার প্রভাবে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দীর্ঘকালে হ্রাস পেয়েছে। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতেও বার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

খ. **চামড়া:** চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশে একটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য। তবে সম্প্রতিককালে এই পণ্যটির রপ্তানিতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এই পণ্যটি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে সক্ষম হয়।

গ. **তৈরি পোশাক:** বর্তমানে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪,০৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রপ্তানির ৪১.৭% ভাগ। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের কৃতিত্ব অভূতপূর্ব। ১৯৭০-এর দশকে প্রায় অজ্ঞাত একটি পণ্য থেকে বর্তমানে এটি একটি প্রধান রপ্তানি পণ্যে উন্নীত হয়েছে। এই পণ্যের একটি দুর্বলতা হচ্ছে এটির আমদানি নির্ভরতা। সুতা, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অধিকাংশ উপকরণ আমদানি করা হয় এজন্য এ পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কম।

ঘ. **নীট ওয়্যার:** নীট ওয়্যার রপ্তানি ১৯৮৯-৯০ সালের পূর্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৮৯-৯০ সালে এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ১৩,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থাৎ পাটজাত দ্রব্য ও চামড়া রপ্তানির মোট আয়ের চেয়ে বেশি)।

## ↘ বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে বাণিজ্য ও শিল্পনীতি অনুসরণ করতে থাকে তাকে বলা যায় আমদানি বিকল্প নীতি। এর বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানির উপর শুল্ক ও অশুল্ক বাধা আরোপ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ। এসব নীতির ফলে রপ্তানি তথ্য পণ্য উৎপাদনের তুলনায় আমদানিতব্য পণ্যের উৎপাদন বেশি লাভজনক হত এবং ফলে রপ্তানিতব্য পণ্যের উৎপাদন নিরুৎসাহিত হত। ১৯৮০-এর দশকের প্রথম ভাগ থেকে বাংলাদেশ কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে থাকে এবং এর আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এই নতুন বাণিজ্য ও শিল্প নীতিকে বলা যায় রপ্তানী চালিত প্রবৃদ্ধি কৌশল। এই নীতির অধীনে রপ্তানি উন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

১.১. **শুল্ক হ্রাস:** আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে দেশের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ও কাঁচামালের দাম হ্রাস পেয়েছে।

২.২. **অশুল্ক বাধা অপসারণ:** আমদানি পণ্যের উপর বিভিন্ন প্রকার অ-শুল্ক বাধা অপসারণ করা হয়েছে। এখন মাত্র গুটি কয়েক পণ্যের ক্ষেত্রে এই বাধা আছে। এর ফলে বিদেশ থেকে পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি সহজ হয়েছে। উপরিউক্ত পদক্ষেপের ফলে আমদানি পণ্যের দেশজ উৎপাদনে যে পক্ষপাত ছিল তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৩. **রপ্তানি প্রণোদনাসমূহ:**

ক. **শুল্ক ও কর অবহার:** রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রেয়াতী হারে শুল্ক প্রদান করে যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে পারে। এছাড়া তাদের রপ্তানি আয়ের উপর আয়কর রেয়াত দেয়া হয়।

খ. **শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা:** এই ব্যবস্থার আওতায় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিকারগণকে রপ্তানিতব্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত শুল্ক প্রত্যর্পণ করা হয়। তাছাড়া সম্পূর্ণ তৈরি দ্রব্য রপ্তানির পর এর উপর প্রদত্ত আবগারী শুল্কও প্রত্যর্পণ করা হয়।

গ. **বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা:** এই ব্যবস্থার আওতায় ১০০% রপ্তানি শিল্প ইউনিটসমূহ কোন শুল্ক প্রদান না করে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করতে পারে। আমদানিকৃত উপকরণ প্রথমে বন্ডেড ওয়্যার হাউজে মজুদ করা হয় এবং পরবর্তীকালে সরকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপকরণ খালাস করা হয়।

ঘ. **রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা:** উপরে খ. ও গ. এ বর্ণিত সুবিধা দুটোর ফলে রপ্তানিকারকগণ অবাধ বাণিজ্য অবস্থা ভোগ করেন। এছাড়াও রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করেছে। খুলনা ও সিরাজগঞ্জে আরো দুটি সরকারী এবং চট্টগ্রাম একটি ব্যক্তিগত এলাকা স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসব এলাকায় দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাগণ শুল্ক প্রদান না করে এবং বাধাহীনভাবে রপ্তানিমুখী কারখানা স্থাপন করতে পারেন। তারা ১০ বছরের জন্য আয়কর মওকুফ পান এবং এর পরে রপ্তানি আয়ের উপর ৩০-১০০% হারে আয়কর রেয়াত পান।

ঙ. **রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম:** এই স্কীম সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানিকারকগণকে তাদের পণ্য চালান পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা এবং ব্যাংকগুলোকে রপ্তানি কাজে অর্থায়নের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা:** বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম পর্যায়ে আনা হয়েছে। টাকাকে চলতি হিসাবের সকল প্রকার লেনদেনের জন্য পরিবর্তনযোগ্য করা হয়েছে। এছাড়াও রপ্তানি উৎসাহিতকরণের জন্য নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করা হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা।

## CLASS WORK বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বর্তমান বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যার অসম বণ্টনের কারণে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত কিছু দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সে দেশের অর্থনৈতিক সামর্থের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশ একটি উদ্বৃত্ত জনশক্তির দেশ এবং এই উদ্বৃত্ত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হলে, তারা এ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের দেশে জনশক্তি রপ্তানি ও তাদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বোয়সেল (BOESL) এবং বায়রা (BAIRA) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

**বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমশক্তি এবং জনশক্তি রপ্তানির চালচিত্র:** বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতবিছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতারিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েচে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারাবিশ্বে অন্তত ৭০ লাখ বাংলাদেশী বৈধভাবে চাকরি নিয়ে বসবাস করছেন, যার প্রায় ৬০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। তন্মধ্যে শুধু ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মোট জনশক্তির ৫৭%ই সৌদি আরব গমন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭.১০ লাখ বাংলাদেশি নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছেন। সংখ্যার বিচারে সৌদি আরবের পরে বর্তমানে ওমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ৭২,৬৫৪ জন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন- কুয়েতে ৫ শতাংশ, কাতারে ৫ শতাংশ ও লিবিয়ায় ১ শতাংশ বাংলাদেশি শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশিষ্ট ২৫ শতাংশের মালয়েশিয়া (৮ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৬ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ১১ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশি শ্রমশক্তি।

**বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা একটি অন্যতম বিচার্য বিষয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে ন্যুজ জাতীয় অর্থনীতিতে জনসংখ্যার ইতিবাচক ভূমিকার নজীরও বিরল নয়। মানব পুঁজি (Human Capital) গড়ার মাধ্যমে চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের অবস্থানকে যেভাবে উন্নত করেছে তা আমাদের দেশেও সম্ভব। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী না হওয়ায় এ বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত দক্ষ জনশক্তি বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা নিচে আলোচিত হরো:

১. **জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত জনশক্তির অধিকাংশই গ্রামীণ জনগণ। এ বিপুল পরিমাণ জনশক্তির প্রেরিত অর্থ গ্রামীণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে এসব পরিবারের অন্যান্য কর্মক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় পুঁজি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, কৃষিতে বিনিয়োগ প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং সার্বিকভাবে এসব জনগণের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটে। তাছাড়া এসব শ্রমিক দেশে ফেরার পথে যে সব দ্রব্যসামগ্রী যেমন-মোবইল ফোন, টিভি, ভিসিডি, ডিভিডি, পোষাক, প্রসাধনী সামগ্রীসহ ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে আসে তাতে তাদের পরিবারসহ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

২. **কৃষি উন্নয়ন:** দেশের কৃষি খাতে বর্তমানে অতিরিক্ত জনশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। অন্যদিকে কৃষিতে নিয়োজিত এসব অতিরিক্ত শ্রমিককে শিল্পখাতে স্থানান্তরের কারণে প্রয়োজনীয় শিল্পায়ন হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত এ শ্রমশক্তি কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা না রেখে বরং শ্রমিকের মজুরি হ্রাসসহ মাথাপিছু উৎপাদনশীরতার হারকে হ্রাস করছে এবং শ্রমের অপচয় হচ্ছে। তাছাড়া কৃষক পরিবারগুলো কৃষিতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সরবচরাহকৃত ঋণও পর্যাপ্ত নয়। এমতাবস্থায় বিদেশে কর্মরতা শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ কৃষক পরিবারগুলোর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে অতিরিক্ত অর্থের এ যোগান সার্বিক কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া পূর্বের ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলোও বিভিন্নভাবে বিদেশে চাকরি পাওয়ার সুবাদে ন্যূনতম কৃষিজমির মালিক হচ্ছে।

৩. **বিনিয়োগ:** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ দেশে বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ অর্থ যোগানের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে আমানত ও বিনিয়োগের বিভিন্ন স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য লাভজনক করমুক্ত সুদ/মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি স্বদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন এ জাতীয় স্কিমের উল্লেকযোগ্য দিক হরো:

ক. অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদি আমানত (Non-resident Foreing Currency Deposit-NFCD),

খ. ওয়েজ আর্নাস ডেভেলপমেন্ট বন্ড,

গ. পোর্ট ফোলিও বিনিয়োগের জন্য অনিবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাবে (Non-resident Investors Taka Account-NITA)।

এসব সুবিধা গ্রহণ করে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, যা একই সাথে তাদের নিজের এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

৪. **দারিদ্র্য বিমোচনন:** বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনেও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা এ সকল জনশক্তির অধিকাংশই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তভূক্ত যাদের প্রেরিত অর্থ তাদের নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য অন্যতম অনুঘটক (Catalyst) হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এ পরিবর্তন প্রথমত গুটি কয়েক পরিবারের মধ্যে আসলেও তা সার্বিক দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন তাদের পরিবারগুলো গ্রামীণ মহাজন কিংবা এনজিও নামক আধুনিক পরিবর্তিত মহাজনদের অশুভ শিকারে পরিণত হওয়া থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া তাদের এ অর্থ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আগমনের ফলে গ্রামীণ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি তথা তাদের পরিবারের সদস্যদের উন্নয়নে এবং দীর্ঘমেযাদি দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভুমিকা পালন করে।

৫. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস:** বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি রয়েছে এ জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে তা বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর যার কোনো ইতিবাচক ফলাফল বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিসরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বরং এ ঋণের বহন করে জাতীয় অর্থনীতি আজ ভীষণভাবে ন্যুব্জ। এমতাবস্থায় বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ এ নির্ভরতা হ্রাস করে স্বনির্ভর অর্থনীতি ভিত নির্মাণে সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া বতৃমানে বৈদেশিক ঋণ শোধের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস জনশক্তি রপ্তানি।

৬. **আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষা:** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা রাখে তা হলো এ অর্থ দেশের আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কেননা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এটি একটি বিরাট খাত। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প, যা শীর্ষস্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত তাও হুমকির মুখে এবং সম্ভাব্য বিপর্যয় বাস্তব হলে দেশের অর্থনৈতিক বিপযয়ও নিশ্চিত। এমতাবস্থায় দেশের গার্মেন্টেস শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি বিপর্যস্ত জনশক্তি রপ্তানি খাতের ব্যাপার মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া পূর্বতন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শীর্ষ খাত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিও আজ বিপর্যস্ত। সুতরাং দেশের বিদ্যমান জনশক্তিকে বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অন্যতম খাতে পরিণত করার সম্ভবনা খুবই উজ্জ্বল।

তাছাড়া দেশ বর্তমানে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য মেশিনারি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং শিল্পায়নেও জনশক্তি রপ্তানি থেকে আসা রেমিটেন্স ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** দেশীয় অর্থনীতিতে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ্য করা যায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এর প্রতিফলন দুভাবে ঘটে: ক. বেকার জনগোষ্ঠী বিদেশে স্থানান্তর, খ. তাদের প্রেরিত অর্থে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

ক. বাংলাদেশে বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ বেকার। দেশের বর্তমানে প্রায় তিন কোটি লোক বেকার রয়েছে। অন্যদিকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় আড়াই লাখ লোক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাচ্ছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হার হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে দেশে যেসব শিক্ষিত বেকার নিম্নমানের কাজ করতে রাজি হতো না তারাও বিদেশে গিয়ে অনুরূপ কাজ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগাচ্ছে। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যেমন- এ পর্যন্ত বিদেশে যাওয়া শ্রমিকদের প্রায় ৫৪.৬%ই তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত জনের সহযোগিতায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় কিছু সমস্যা থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক ভূমিহীন লোক পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

খ. বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা নিজেদের বেকারত্ব ঘোচানোর পামাপাশি পরিবারের অন্যদের বেকারত্ব ঘোচানোর ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কেননা তাদের প্রেরিত অর্থ তাদের পরিবারের অন্যান্য পূর্ণ ও মৌসুমী বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করছে এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের প্রেরিত অর্থে গড়া প্রতিষ্ঠানে বাইরের অনেক শ্রমিকেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে।

**বোয়েসেলের ভূমিকা:** বোয়েসেল বা Bangladesh Overseas Employment and Service Limited হলো দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৪ সালে এটি প্রতিষ্টিত হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্ঠিতে বোয়েসেল-এর গুরুত্ব ও ভুমিকা অপরিসীম। বোয়েসল এর ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. জনশক্তি আমদানিকারক দেশের নিয়ম-নীতি মেনে স্বল্প খরচে ও নিরাপদে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করা;
২. বৈদেশিক নিয়োগকর্তাকে 'সঠিক কাজের জন্য সঠিক লোক' নির্বাচনে সহায়তা করা;
৩. অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা;
৪. মহিলা শ্রমিকদের জন্য কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

**বায়রার ভূমিকা:** বায়রা বা Banglaesh Association of International Recruiting Agencies হলো জনশক্তি রপ্তানিকারক বেসরকারি এজেন্টদের একটি সংগঠন। এটি ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়। মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে জনশক্তি আমদানি কারক দেশের সরকারি সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই সংগঠনটির প্রধান কাজ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংগঠনের ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. আমদানিকারকের চাহিদামত প্রয়োজনীয় জনশক্তি যোগানের ব্যবস্থা করা।
২. আমাদানিকারক, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও বিদেশগমনেচ্ছদের জন্য পাইপলাইন হিসেবে কাজ করা।
৩. বিভিন্ন দেশের আমদানিকারক সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বোয়েসেল এর পাশাপাশি বায়রা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বর্তমানে বায়রার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সীমা নির্ধারণের জন্য আইন তৈরির প্রস্তুতি চলছে। বোয়েসেল, বায়রাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগের ফলেই আজ আমাদের দেশ জনশক্তি রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয়।

➘ **জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা:** বাংলাদেশে রপ্তানিখাতের অন্যান্য উপখাতের মতো জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও সমস্যা বিদ্যমান। যেমন-

১. **শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা ও শ্রমিকের দক্ষতার অভাব:** আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বর্তমানে প্রতিযোগিতা ব্যাপক। এ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদাই বেশি। অথচ আমাদের শ্রমিকদের প্রায় ৪৭.৪০ শতাংশ অদক্ষ। এমতাবস্থায় নিয়োজিত অদক্ষ শ্রমিকরা কম মজুরিতে কাজ করছে এবং নতুন শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রেও দক্ষ শ্রমিকের অভাব কাঙ্ক্ষিত বাজারে টিকে থাকা যাচ্ছে না এবং আমদানিকারক দেশগুলো আমাদের ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে।

২. **অবৈধ উপায়ে লোক প্রেরণ:** বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের ফলে অনেক শ্রমিকই বিদেশে গিয়ে অধৈ শ্রমিকে পরিণত হয় এবং নিয়োগকর্তা, পুলিশ ইমিগ্রেশান কর্তৃপক্ষের নির্যাতনের শিকার হয়েও কোনো আইনগত সহায়তা নিতে পারে না। ফলে সেসব শ্রমিক নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি শ্রম বাজারে দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়।

৩. **শ্রম বাজার সম্পর্কে ধারণার অভাব:** জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত সরকারের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকার ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকার বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ অধিকাংশই নিম্ন মজুরিতে অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে থাকে। যার প্রমাণ হলো গত ১০-১৫ বছরে যেখানে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পেয়েচে সেখানে আধা দক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মোতাবেক শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশ প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে এরূপ পদক্ষেপের অভাবেই আজ বাংলাদেশ ক্রমে বাজার হারাচ্ছে।

৪. **বিদেশে বাংলাদেশী মিশনগুলোর অসহযোগিতা:** শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান বিদেশে বাংলাদেশী মিশনগুলোর অসহযোগিতর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মিশনগুলোর উদাসীনতা, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতির পাশাপাশি শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাবও দায়ী।

৫. **প্রেরিত অর্থের অদক্ষ ব্যবহার:** অভিবাসী বিপুল পরিমাণ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণে তাদের অনাগ্রহ থেকে যেমন প্রেরিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায় তেমনি প্রেরিত অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা, অতিরিক্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনে আনা, পারিবারিক ও আচার অনুষ্ঠানে বেহিসেবি খরচ প্রভৃতি কারণে এ টাকার বিপুল অংশই অপচয় হয়। ফলে চুক্তি শেষে দেশে ফিরে শ্রমিকদের পুনরায় সংকটে পড়তে হয়।

৬. **দক্ষতার প্রমাণপত্রের অভাব:** আমাদের দেশে অনেক লোক আছে যারা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ কিন্তু তাদের কোনো সার্টিফিকেট নেই। এমতাবস্থায় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তার কাঙ্ক্ষিত চাকরিটা পায় না। এ ক্ষেত্রে সরকারি এমন কোনো ব্যবস্থাও নেই যাতে সহজেই সে তার প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রত্যয়নপত্র পেতে পারে।

৭. **বৈদেশিক নিয়োগকারীদের প্রদেয় বৈদেশিক মুদ্রা:** বিদেশে আমাদের দেশের শ্রমিকরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার একটা বিরাট অংশ পুনরায় বৈদেশিক নিয়োগকারী এজেন্টদের কাছে চলে যায়। কেননা প্রতিটি শ্রমিক পিছু এদেরকে বৈদেশিক মুদ্রার বেশ অঙ্কের ফি দিতে হয়। ফলে কষ্টার্জিত বৈদিশিক মুদ্রার পরিপূর্ণ ফল আমরা ভোগ করতে পারি না।

৮. **বিদেশে নিয়োগকারীদের হয়রানি:** বিদেশে নিয়োগকারীরা শ্রমিকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে। শ্রমিকদের কাগজপত্র জব্দ করে নেয়া, মূল চুক্তি বাতিল করা, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি এর অন্যতম। ফলে অনেক শ্রমিকই সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফেরে কিংবা অবৈধ শ্রমিক হিসেবে নানা নির্যাতনের শিকার হয়।

**সুপারিশসমূহ:** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে জনশক্তি রপ্তানির মতো বিপুল সম্ভাবনাময় এ খাতটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সেজন্য যেসব বিষয়গুলোতে নজর দেয়া আবশ্যক তা হলো:

১. **উপযুক্ত সরকারি নীতি: ১৯৮২** সালের অভিবাসী আইন (Immigration Ordinance) টির সংস্কার কারে এতে শ্রমিকদের জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় নীতির সংযোজন ও সংস্করণ আবশ্যক। এছাড়া বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের ভূমিকার স্বীকৃতি ও অর্জিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটা জাতীয় নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

২. **মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা:** দেশে এবং বিদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ ও জোরদার করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে BMET-এর মনিটরিং ইউনিটকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানও জুরুটি।

৩. **যোগ্য ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান:** যেসব শ্রমিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ সরকারের উচিত তাদেরকে যথাযথ সার্টিফিকেট প্রদান করা।

৪. **উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবর্ধক কর্মসূচি:** জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি কেবল শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টা ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থার কাছে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের উচিত এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। সে জন্য সরকারের যা করা উচিত তা হলো:

**প্রথমত,** দেশত্যাগপূর্ব সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ (Pre-departure awareness building training) গ্রহণকে সকল শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা। এতে তাদেরকে বিদেশে তাদের অধিকার ও কর্তব্য, নিয়োগকারী দেশের আইন-কানুন, দূতাবাসের ঠিকানা ও জরুরি যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার তথ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হবে।

**দ্বিতীয়ত,** প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে টিকে থাকার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা জরুরি। সেজন্য কম খরচে বাজার গবেণা কর্মসূচি গ্রহণের সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা ও চাহিদার ধরন নির্ণয় আবশ্যক। অতঃপর চাহিদা মাফিক শ্রমিক সরবরাহের নিমিত্তে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসচি গ্রহণ আবশ্যক।

**তৃতীয়ত,** যেসব দক্ষ শ্রমিক তাদের সংশ্লিষ্ট Informal tor-এ রয়েছে রসকারের উচিত তাদেরকে প্রজোনীয় ভাষা জ্ঞান ও হিসাব-নিকাশের সংক্ষিপ্ত প্রমিক্ষণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেয়া।

৫. **পুনর্বাসন:** দেশের ফেরৎ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন ও অন্যান্য অর্তনৈতিক কার্য, ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা আবশ্যক, যাতে তারা তাদের অর্জিত সম্পদ ও অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

৬. **বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের নেটওয়ার্ক সৃষ্টি:** বিদেশ ফেরৎ শ্রমিক ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের দাবি দাওয়া ও সমস্যাবলী গ্রন্থিকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভুত করার জন্য একটি সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক আবশ্যক।

৭. **আমানত ও বিনিয়োগ স্কিম:** সহজ ও দক্ষ বিনিয়োগ স্কিমের মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থ খাটানো এবং সঞ্চয়ের ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও উৎসাহব্যাঞ্জেক করা আবশ্যক, যেন দেশে ফিরে তাদের পুনর্বাসন সহজ হয়।

৮. **দূতাবাসের সক্রিয় ভূমিকা:** বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে শ্রমিকদের প্রয়োজনে সাড়া দানের উপযোগী করতে হবে। সেজন্য-

**প্রথমত,** সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের Labour Attache-কে শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ও তাদরে অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

**দ্বিতয়িত,** দূতাবাসকে শ্রমিকদের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সরবরাহ এবং দূতাবাসে তাদের নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে।

**তৃতীয়ত,** শ্রমিকদের আইনগত বৈধতা-অবৈধতা নির্বিশেষে সকল শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**চতুর্থত,** শ্রমিকদের যাবতীয় অভিযোগ দূতাবাসকে অবহিত করার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহী করতে হবে।

৯. **কার্যকর দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক চুক্তি ও সংস্থা:** জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর একটা আঞ্চলিক ফোরাম থাকা আবশ্যক এবং এক্ষেত্রে SAARC-কে ভিত্তি করেই তা গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া সম্ভাব্য শ্রমিক আমদাকিারক দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক যোগযোগ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনও গুরুত্বপূর্ণ।

১০. **ডাক ও ব্যাংকি ব্যবস্থা সংস্কার:** ডাক ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে এতে স্বচ্ছতা আনা আবশ্যক, যাতে প্রবাসী শ্রমিকরা এ সকল বৈধ মাধ্যমে তাদের অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং সরকারও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত না হয়।

১১. **শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার :** বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তাকে কর্মমুখি করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রেড কোর্স চালু এবং উচ্চতর পর্যায়ে কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দেয়া জরুরি।

১২. **প্রেরিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:** শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে এ ব্যাপারে নাগরিক পর্যায়ে উৎসাহী করতে হবে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অর্থকে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

গণতরিন্ত্রক রাজনীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে ধাবমান বাংলাদেশকে এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে হলে এর ১৬ কোটি মানব সন্তানকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে এবং এর মানব সম্পদই মানব পুঁজিতে রূপান্তরিত হযে বিশ্ব অর্থনীতিতে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে নেবে। এ জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো জনগণকে শিক্ষার মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ, শ্রমিক প্রেরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।

## CLASS WORK বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিনিয়োগের সাথে উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবন হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি, সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন জাতি, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সেবা ও পণ্যাদি আদান-প্রদান সম্ভব হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার 'পরবর্তী উদীয়মান তারকা'। তথাপিও বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং বিদেশী বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েচে শত- সহস্র প্রতিবন্ধকতা।

**অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ:** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে পরিমাপক হিসেবে ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞাটি প্রচলিত তা হলো: 'Economic development is the process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time.' মূলধন গঠন ছাড়াও বৈদশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনেতিক উন্নয়নে খাতে আর্থিক সুবিধা সৃষ্টি করেছে। এগুলো হলো: ১. রপ্তানি বৃদ্ধি; ২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি; ৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; ৪. উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি; ৫. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। বিনিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে মলধন। প্রধানত তিনটি মূল উৎস থেকে মূলধন। প্রধানত তিনটি মূল উৎস থেকে মূলধন সংস্থাপন হয়। যেমন: ১. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২. বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং ৩. বৈদেশিক সাহায্য।

**বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের চিত্র:** বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চারিয়ে যাচ্ছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের চেয়ে বাংলাদেশ উদারভাবে দেশকে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য মুক্ত করে দিয়েছে। বাংলাদেশের হাতে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবঙ এর প্রভাব সম্পর্কে অনেকে বাংলাদেশকে এশিয়ার 'Emerging Tiger' বা 'উদীয়মান ব্যাঘ্র' হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্বব্যাংক ও IFC প্রকাশিত Doing Business 2015 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business: সুরক্ষার (protecting investors) ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৩তম। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩১তম এবং ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে ১১৫তম।

**বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা:** বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি টাস্কফোর্সের খসড়া প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৪টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

১. বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি;
২. অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব;
৩. বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জায়গাতেই সেবা প্রদানের ব্যবস্থা অর্থাৎ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অভাব;
৪. ঘোষিত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ও সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের অভাব;
৫. শ্রমিক বিশৃঙ্খলা ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর জঙ্গিপনা;
৬. হরতালসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড;
৭. প্রতিযোগী দেশগুলোর তুরনায় ইনসেনটিভ বা উৎসাহদানের অভাব ও অবকাঠামোগতভাবে পিছিয়ে থাকা;
৮. কাস্টমস ছাড় করানোর জটিলতা;
৯. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মশক্তির অভাব;
১০. নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাব;
১১. দুর্নীতি;
১২. আমদানি ও বাণিজ্যনীতির অতি দ্রুত উদারীকরণ করার ফলে স্থানীয় পণ্য উৎপাদন শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব;
১৩. দক্ষ ও কার্যকর বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ের অভাব;
১৪. ঋণের ওপর সুদের উচ্চহার।

নিচে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিযোগের উপরোক্ত সমস্যাসমূহ এবং অন্যান্য কতিপয় সমস্যাদি আলোচনা করা হলো:

১. **বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি :** সম্প্রতি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স-এর মহাসচিব বলেছেন, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায় দুর্বল অবকাঠামো ও বিদেশে বাংলাদেশের মলিন বাবমূতি। বিদেশীদের কাছে বাংলাদেশের একটা নেতিবাচক ইমেজ রয়েছে যে, বাংলাদেশ হলো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত দেশ। বাংলাদেশ ভাবলেই বিদেশীদের অনেকেই দেখে পানিতে ডোবা একটি দেশের ছবি। সেই দেশে শুধু খাদ্যাভাব আর দুভিক্ষ। বাংলাদেশের আর একটা ইমেজ হলো, সাহায্য চাওয়া। বাংলাদেশ মানে যেন ইন্টারন্যাশলান বাস্কেট বল, সেখানে শুধু দান করা, শুধু দেয়া। বিদেশে এমন একটা ধারণাও গড়ে উঠছে যে, বাংলাদেশকে কিছু দিলে সেটা আর ফেরত পাওয়া যায় না, বাংলাদেশকে শুধু দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশকে যেন শুধু খেলাপি ঋণের দেশ এবং সরকারি কর্পোরেশনসমূহের প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা লোকসান দেয়ার দেশ। বাংলাদেশ মান রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শুধু গিঁটের পর গিঁট পড়া, সে সবের কোনো সমাধান না হওয়া। বস্তুত বাইরে বাংলাদেশের এ ধরনের নেতিবাচক ভাবমূর্তির কারণে লগ্নিকারক দেশ ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে বড় যে কোনো বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্থ থাকে।

২. **অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব:** বিদেশী বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশে তার পর্যাপ্ত অভাব ও ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, রেল ও সড়ক ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত নয়। সবচেয়ে করুণ বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত অবস্থা। কল-কারখানায গ্যাস, পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি সময়মতো এবং চাহিদামতো পাওয়ার কোনো গ্যারন্টি নেই, নেই ঠিকমতো টেলিফোন ব্যবহারের নিশ্চয়তা। বাংলাদেশের কোনো সরকারই এ যাবৎ অকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এ অবস্থায় দেশী বিনিয়োগকারীরাই বিনিয়োগে ভরসা পায়না।

৩. **হরতারসহ নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড :** হরতালসহ নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের উন্নয়নের জন্য হরতাল একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা, দেশটিতে একদিনের হরতালে ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহের উদাসীনতার কারণে পুনঃ পুনঃ ডাকা হরতালে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৪. **দুর্নীতি :** বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশ দুর্নীতির ওপর ভাসছে। দুর্নীতি হচ্ছে এমন একটা দুষ্ট ক্ষত যা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক। বর্তমানে বৈদেশিক বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গৃহীত সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়শীল দেশেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলছে এ দুর্নীতি। এমতাবস্থায় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্থ থাকাটাই স্বাভাবিক।

৫. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা :** আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। শিল্প ও বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় অহেতুক বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ থাকায় বিনিয়োগ উৎসাহিত হতে পারছে না। শিল্প-বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় বিরাজমান এসব অহেতুক বিধি-নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্য উচ্ছেদ না করলে যতই বাণিজ্য টিম পাঠানো হোক, বা নতুন-আইন-বিধি তৈরি করা হোক কিংবা বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হোক, কোনোদিনই বিদেশী বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উৎসাহিত হবে না।

৬. **বিনিয়োগ বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা :** বিনিয়োগ বোর্ড একটি স্পেশালাইজড প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এখানে থাকা উচিত পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, এমবিএ ডিগ্রিধারী দক্ষ লোকজন, যারা এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বোঝেন। এ ধরনের দক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যক না থাকা বিনিয়োগ বোর্ডের ব্যর্থতার একটি কারণ। তাছাড়া বিনিয়োগ বোর্ডের আরেকটি সমস্যা হলো ঘন ঘন নির্বাহী পদে রদবদল।

৭. **দক্ষ ও কার্যকর বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ের অভাব :** বিনিয়োগ ও সকল শিল্পায়নের অন্যতম মৌলিক শর্ত হচ্ছে যথাযথ ব্যাংকিং সহায়তা। বাংলাদেশে তা সম্পূর্ণরূপেই অনুপস্থিত। কোনো ব্যাংকেরই যথাযথ দায়িত্ব ও অধিকারের ভিত্তির ওপর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই। ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণগ্রহীতা ও দলীয় দৌরাত্ম্যের কাছেই অনেক সময় জিম্মি থাকে। তাই ব্যাংক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না দিলে বাংলাদেশে কখনো বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে না।

৮. **প্রতিকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :** বাংলাদেশে বাইরের পুঁজি না আসার এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজির স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত না হয়ে ওঠার আর একটি গুরুতর কারণ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনা বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের 'ল অ্যান্ড অর্ডার' সঠিক থাকার ওপর। কিন্তু বাংলাদেশে দোকানে, মহল্লায়, কল-কারখানায়, দালান-কোঠা নির্মাণে চাঁদা দাবি করা একটা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। থানা পুলিশ বহুক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের ইঙ্গিতে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসকে আনুকূল্য দেয়। রক্ষক ভক্ষকে পরিণত হলে ফল কি হয় তা সহজেই অনুমেয়।

৯. **কর প্রশাসনের অব্যবস্থা :** বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট না হওয়ার আরো একটি কারণ হলো বিরাজমান কর কাঠামো ও কর প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের নির্যাতন ও দুর্নীতি। বহু উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কর কাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে, ক্যাপিট্যাল গেইন ট্যাক্স হ্রাস করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

১০. **নির্ভেজাল জমি সংকট** বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা নির্ভেজাল জমি। যে কোনো বড় শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হলে ২০ থেকে ২৫ একর জমির প্রয়োজন হয়। কিন্তু নির্ভেজাল জমি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

১১. **ব্যাংক ঋণ সমস্যা :** দেশীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমানে সবচাইতে বড় সমস্যা ব্যাংক ঋণ। বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে বিভিন্ন ব্যাংক কনসোর্টিয়াম গঠন করে অর্থের যোগান দেয়ার বিধান চালু আছে। বেশ কিছু দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তা এ ধরনের শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদন করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এচাড়া ১০ কোটি, ১৫ কোটি টাকার শিল্প ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যাংকে দাখিল করে ঘাটে ঘাটে ঘুরে হয়রানি হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে শুধু ঘুরপাকের নীতিই অবলম্বন করছে। আর যখন শিল্প স্থাপনের জন্য কেউ ব্যাংক ঋণ পায় তখন বৈদেশিক মুদ্রার উঠানামা, যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই সংকট শুরু হয়ে যায়।

### ↘ বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা

**'2020 Bangladesh :** A Long Run Perspective Study' শীর্ষক সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের এক দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি বিনিময় হার অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা।

উক্ত রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক বলেছে, এ পর্যায়ে FDI আহরণের জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক রেগুলেটরি পরিবেশ সৃষ্টি রতে হবে। মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করতে হবে। যদি তা করা হয়, তবে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিশ্বব্যাংকের এ রিপোর্টে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০২০ সালে কেমন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব তার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, এ সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমবে। গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭% থেকে ৮%-এ উন্নীত হবে। সর্বজনীন বয়স্ক শিক্ষা ও মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে। কার্যকরভাবে পরিবেশ সংরক্ষিত হবে। সাফল্যের সাথে নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবে। ২৫ বছরে ৫ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং দ্রুততর প্রবৃদ্ধির জন্য সম্পদের যোগান বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববাজারে চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলকবাবে অর্থনীতির বহুমূখীকরণ ঘটবে। এতে বলা হয়, এ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থায়নের সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে FDI।

বিশ্বব্যাংক রিপোর্টটিতে ২০২০ সালের উজ্জ্বল বাংলাদেশ গড়ার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে বলেছে, তা অর্জনের জন্য বর্তমানে প্রচলিত অনেক রীতিনীতির পরিবর্তন আনতে হবে। প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও দুর্বল শাসনব্যবস্থাসহ বিভিন্ সমস্যার মোকবিল করতে না পারলে এ সমৃদ্ধির স্বপ্ন শুধু কল্পনাই রয়ে যাবে। রিপোর্টটিতে প্রকাশিত প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সম্পর্কে আশাবাদী হতে সমর্থন যোগায়। এছাড়া বিদ্যমান যেসব সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. **তেল ও গ্যাসক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা:** যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। তাদের মতে, বাংলাদেশে এ খাত বিপুল সম্ভাবনায়ময়। এদিকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের Energy sector-এ মার্কিন কোম্পানিগুলোর সরাসারি বিনিয়োগ প্রায় শূন্য থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং অতিরিক্তি হিসেবে আরো কয়েকশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অপেক্ষায় আছে।

   মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছর ধরে অনুসন্ধান চালাবার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম তেলখনিসহ অন্তত ১৭টি তেলখনি রয়েছে। আর তেলের মান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়, তেল কূপ খনন ও উত্তোলনের খরচ বাদ দিলেও প্রাপ্ত তেল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে বর্তমান মাথাপিছু আয়ের অন্তত ১৪ শত গুণ বেশি। অবশ্য এ রিপোর্ট বিতর্কিত ও সন্দেহজনক হলেও এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের তেল সম্পদের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনাময়।

   পেট্রোবাংলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (ইউএসিএস) ও পেট্রোবাংলার যৌথ সমীক্ষা রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিএসএফ), যা গ্যাস সম্পদ উত্তোলনে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আগমন সম্পর্কে আশাবদী হতে সমর্থন যোগায়।

২. **ইপিজেডে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়েগের অন্যতম সম্ভাবনা হলো ইপিজেড এলাকায় বিনিয়োগ। বাংলাদেশে নতুন কোনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইপিজেড-এর অভ্যন্তরস্থ প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ বছর Tax Holiday বা শুল্ক রেয়াত অনুমোদিত। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ইপিজেড এলাকায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ইপিজেড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর, কুমিল্লাসহ দেশে আরো ৬টি ইপিজেড নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া উত্তর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বেসরকারি ইপিজেড নির্মাণাধীন রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, বাংলাদেশ এখন শিল্পযুগে পর্দাপণ করেছে এবং দেশে দ্রুত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

৩. **বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ অর্জনকারী শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প বা তৈরি পোশাক শিল্প অন্যতম। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের বিপুল চাহিদা থাকায় দেশী-বিদেশী প্রচুর বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রথমেই দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং অধিক মুল্যের বাজারে প্রবেশ করতে হবে। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক শ্রেণীর কাজের গুণগত মান ঠিক থাকলে ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় সহজেই টিকে থাকতে পারবে। বাংলাদেশের ক্রমসম্প্রসারমাণ গার্মেন্টস সিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ অচিরেই Garment Valley-তে পরিণত হবে।

৪. **কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সফরকালে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফিদেল রামোস বলেছিলেন, 'কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশে।' উচ্চফলনশীল ধানবীজের ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে তেলবীজ, আখ, তুলা, আলু ও গম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে নাটকীয়ভাবে। তাই বিশ্বায়নের নতুন শতকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৫. **সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পে বিপুল সম্ভাবনাময় এক অসাধারণ সৌন্দর্যমন্ত্রি দেশ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পর্যটন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য উন্নত প্রযুক্তি বা উচ্চ মূলধনের প্রয়োজন নেই। বরং দেশে বিদ্যামান প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সৃষ্ট সুবিধাদি দ্বারাই এ শিল্পকে উন্নততর করে তোলা যায়, যা দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

**↘ সাম্প্রতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বোর্ডের ভূমিকা**

দেশে ও বিদেশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সর্বোত্তম সহায়তা ও উন্নততর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিগত সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত শিল্প ও অব্যাহত রাখায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক মূলধন কাঠামোতে (Gross Capital Formation) বেসরকারি খাতের অবদান সিংহভাগ। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment) গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমশঃ আর্কষণীয়, প্রতিযোগীতামূলক ও ব্যয় সাশ্রয়ী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগমুখী নীতি ও কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ-মানচিত্রে (Investment map) একটি প্রতিযোগী অর্থায়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠা Goldman Sachs বাংলাদেশকে 'সম্ভাবনাময় এগারো' (Next-11) দেশের অন্তর্ভুক্ত করার পুর বিনিয়োগকারীরা আরো আগ্রহী হয়েছেন। JP Morgan বাংলাদেশকে "Frontier Five" দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে অমিত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, বিনিয়োগ পরিবেশ (Investment climate) উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জীবিত করছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরাসরি বৈদেশক বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, তেমনি রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। বর্তমান সরকারের শিল্পনীতিতে কৌশলগত কারণে কয়েকটি শিল্পখাত ছাড়া সকল খাত বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণ করে রপ্তানিনির্ভর নতুন নতুন শিল্প প্রসারের সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি নতুন নতুন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ এবং বাংলাদেশের এসব জোটসমূহের সদস্যপদ প্রাপ্তির ফলে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

## CLASS WORK বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশ একটি অনুন্নত কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ উন্নয়নের পূর্ব শর্তগুলোর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। চলুন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান বাধাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি-

- ✓ **দারিদ্রের দুষ্টচক্র :** বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের বেশিরভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র্যের জন্য একটি অনুন্নত দেশ অনুন্নতই থেকে যায়। বাংলাদেশে দারিদ্রেতার জন্য জনগণের আয়স্তর নীচু। এজন্য দেশে সঞ্চয়ের হার কম। আবার সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ এবং মাথাপিছু উৎপাদনও কম। আবার মাথাপিছু উৎপাদন কম বলে আয়স্তরও কম। এভাবেই দেখা যায় বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।
- ✓ **অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই উঁচু। দেশের আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক এই অত্যধিক জনসংখ্যা দেশের জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে দেখা দেয় মাথাপিছু উৎপাদন ও আয়ের নিম্নহার, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের নিম্নহার, বেকারত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। এগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।
- ✓ **প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে অপূর্ণ ব্যবহার :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক বেশি। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তা ব্যবহার করার দিকটি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নত কলাকৌশলের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সঠিক বিনিয়োগের অভাব এবং সর্বোপরি কার্যকর পরিকল্পনার অভাবে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে পারছে না এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।
- ✓ **উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব :** অবকাঠামো, বিনিয়োগ, জ্ঞান ইত্যাদিসহ আরও অনেক কারণে উন্নত দেশের সকল প্রযুক্তি একটি অনুন্নত দেশে প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্ভব নয়। এজন্য অনুন্নত দেশে এমন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যাতে অধিক শ্রম, অল্প মূলধন এবং অদক্ষ সংগঠক স্থান পায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রযুক্তির মান এখনও অনেক নীচু যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে মন্থর করে রাখছে।
- ✓ **দক্ষ জনশক্তির অভাব :** যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ যদিও একটি জনবহুল দেশ কিন্তু এদেশে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব তীব্র। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান নিম্ন, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগতমান অত্যন্ত নিম্ন। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তির অভাবে সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

- ✓ **মূলধন গঠনের নিম্নহার :** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। তাছাড়া দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে দেশের আয়স্তর নিম্ন। এজন্য সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারও নিম্ন। তাছাড়া দেশের আমদানির চেয়ে রপ্তানি কম। তাই দেশের মূলধন গঠনের হার খুবই নিম্ন যা উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত হতে বাধা দেয়।
- ✓ **উদ্যোক্তার অভাব :** দেশকে উন্নয়নের স্রোতে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে প্রয়োজন দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তার। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা আহরণ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বহন করার মত সাহসী উদ্যোক্তার সংখ্যা দেশে খুব কম।
- ✓ **কারিগরী জ্ঞানের অভাব :** উন্নয়নের ধাপে ধাপে কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞান ছাড়া উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং তার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞানের অভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ড পিছিয়ে আছে।
- ✓ **অবকাঠামোর অভাব :** যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত, শক্তি সম্পদের ঘাটতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব তীব্র। এজন্য এদেশে উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা কম এবং বাজার সীমিত। তাই দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে।
- ✓ **শিক্ষার অভাব :** শিক্ষার অভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার অভাব থাকলে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটলে দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে যায়। বাংলাদেশের জনগণের পথও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
- ✓ **অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা পশ্চাৎপদ ও গতিহীন। বাংলাদেশের কৃষি আজও প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যার ফলে কৃষি ফলন কম হচ্ছে। এজন্য দেশের বৃহত্তম খাত কৃষি থেকে কোন উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা যাচ্ছে না যা মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। ফলে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে না।
- ✓ **বৈদেশিক মুদ্রার অভাব :** দেশকে অগ্রসর করতে হলে প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পায়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য শক্তিশালী না হওয়ায় দেশে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।
- ✓ **খাদ্য ঘাটতি :** বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। এজন্য প্রতি বৎসর দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয় বলে দেশের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ কম থাকে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
- ✓ **প্রতিকূল ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ :** বাংলাদেশে শিক্ষার নিম্নহারের জন্য সমাজে অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বিরাজমান। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন দেশের উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করছে।
- ✓ **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** একটি দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে দরকার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্থিতিশীলতা। কিন্তু বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র বিরাজ না করায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থবিরতা দেখা দেয়।

## CLASS WORK বাংলাদেশে শিল্পায়ন

বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। কারণ শিল্প বিপ্লব মানব জীবনকে স্বপ্নের মতো রঙিন করে দিয়েছে। জীবন হয়েছে সুখের, ভোগের ও আরামের। আবার, অন্যদিকে কতিপয় মানুষ, সমাজ তথা দেশ বিভিন্ন কারণে এর আশীর্বাদ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ তেমনি একটি দেশ, যেটা এখনো শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।

**বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ :** বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতন, রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও বিপ্লবের ফলে শিল্পায়নের তেমন বিকাশ ঘটতে পারেনি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্য, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণেও এ দেশে শিল্পায়ন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **ঐতিহাসিক পটভূমি :** বর্তমান বাংলাদেশ যে ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত তা ঐতিহাসিক বিভিন্ন পর্বে বিদেশীদের দ্বারা শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত, লুণ্ঠিত ও অবহেলিত হয়ে আসছিল। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক বিত বরাবরই থেকেছে দুর্বল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন পাশ্চাত্যে ব্যাপক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলছিল, তারই একটা বিশেষ পর্বে (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশ যুগে শাসকগোষ্ঠী ভারতের কয়েকটি স্থানে যেমন- কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাস প্রভৃতি এলাকায় শিল্প-কারখানা গড়ে তুললেও এ অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার শিল্পায়নে কোনো প্রয়াস নেয়নি। অধিকন্তু তখন বাংলাদেশ ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য বিক্রির অন্যতম বাজারে পরিণত হয়। ফলে শিল্পায়ন তো দূরের কথা, ব্রিটিশ শিল্পজাতদ্রব্য এখানে আমদানির ফলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পও ভেঙ্গে পড়ে।

২. **উদ্যোক্তার অভাব :** মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে সক্ষম এমন উৎসাহী ব্যক্তি তথা উদ্যোক্তার অভাব থাকায় বাংলাদেশ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত সমাজে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৩. **আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হলে দরকার আধুনিক প্রযুক্তির পর্যাপ্ততা তথা প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান। কারণ প্রতিটি শিল্প-কারখানায়ই আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। সেজন্য কেবল পুঁজি ও সদিচ্ছা থাকলেই শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা যায় না। শিল্প-কারখানা বৃবহৃত হবে এমন যন্ত্রের কলকজা, চালন ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের জনগণের সে জ্ঞানের অভাবে শিল্প- কারখানা গড়ে উঠেনি।

৪. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** বাংলাদেশ শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দক্ষ শ্রমিকের অভাব। আমাদের দেশে শিক্ষার হার খুবই কম। তার ওপর শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে, তা দক্ষ শ্রমিকের অভাব পূরণে ব্যর্থ কারণ আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব সর্বত্র বিরাজমান। ফলে আমাদের বেকার জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশই প্রযুক্তি জ্ঞানহীন। সুতরাং দক্ষ শ্রমিকের অভাব আমাদের দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা।

৫. **রাজনৈতিক কারণ :** শিল্পায়নের দুটি রাজনৈতিক কারণেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যেমন:

ক. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন কারণে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং বারবার শিল্পনীতি পরিবর্তিত হওয়ায় বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না

খ. কোনো শিল্পপতিই চায় না যে, তার কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হোক। কারণ উৎপাদন ব্যাহত হলে তার লোকসানের আশঙ্কা থাকে। বিভিন্ন কারণে হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল, ভাংচুর হলে শিল্পপতিরা শিল্প-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ বোধ করে না।

৬. **প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। যারা দরিদ্র নয় তাদের অনেকেরই আবার সঞ্চয় করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। আর সঞ্চয় না থাকলে শিল্প- কারখানায় বিনিয়োগের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য চাই প্রচুর মূলধন। তাই প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবেও এখানে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। জনসাধারণের যে ক্ষুদ্র অংশটি মূলধন গঠনে সক্ষম তাদের অনেকেই আবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় না। তারা তাদের অর্থ জাঁকজমকপূর্ণ ঘরবাড়ি, জমিজমা, স্বর্ণালংকার, গাড়ি ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য সামগ্রীর পেছনে ব্যয় করে। সুতরাং মূলধনের অভাব বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়।

৭. **মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব :** ব্যাপক মাদ্রাস্ফীতি শিল্প-কারখানা গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। একটি বৃহৎ শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। ঐ কারখানা স্থাপনের শুরুতে যে অনুমানিক খরচ ধরা হয় তা থেকে বছরের ব্যবধানে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সে খরচ অপর্যাপ্ত মনে হয়। কারণ বিভিন্ন উপকরণের দাম অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলে। এমন অবস্থায় গৃহীত প্রকল্প ষেশ করতে আরো অর্থ খরচ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশে কোনো শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে তাই স্থির কারা সম্ভব নয় যে, তাকে প্রকল্পের জন্য মোট কত অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর এসব কারণেই অনেক শিল্প উদ্যোগী ব্যক্তি শিল্প স্থাপনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৮. **শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের অভাব :** এ কথা ঠিক যে, শিল্পায়িত অনেক দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জতিক সংস্থা বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে তাদের সাহয্যের হাত অধিকতর সম্প্রসারিত করেছে। তবে অভিযোগ রয়েছে, ঐ সব সাহায্য শর্তহীন নয়। সাহায্যদাতা দেশগুলো তাদের দেশের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমাদেরকে অধিক দামে কিনতে এবং সে দেশের টেকনিশিয়ান বা এক্সপার্টদের অনেক বেতনে এ দেশের বিভিন্ন প্রযুক্তি পরিচালনায় চাকরি দিতে শর্ত আরোপ করে। ফলে বৈদেশিক সাহায্যের একটা উল্লেকযোগ্য অংশ সাহায্যদাতা দেশেই নানাভাবে ফিরে যায়।

৯. **উন্নত যোগাগো ব্যবস্থার অভাব :** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। বিশেষ করে স্থল ও জলপথ ব্যবস্থা অদ্যাবধি এতই অনুন্নত যে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে আনা-নেয়া সম্ভব হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বলেই আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা অনুসারে শিল্প-কারখানা স্থাপন কা যাচ্ছে না। কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায়ই শিল্প-কারখানা স্থাপনের কাজ সীমাব্ধ হয়ে আছে। সাম্প্রতিক কালের যানজট ও প্রতিনিয়ত পরবহন ধর্মঘট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

১০. **কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের অভাব :** শিল্পের জন্য চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে ও নিয়মিতভাবে কাঁচামালের সরবরাহ। দেশে বিভিন্ন ধরনের ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাঁচামাল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। এগুলো আমদানি করতেও প্রচুর খরচ লাগে। আবার শিল্পের জন্য দরকার পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদ বা খনিজ সম্পদ। যেমন-তেল, লৌহ, কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি। এগুলোরও চাহিদা অনুপাতিক অভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১১. **দেশাত্মবোধের অভাভ :** আমাদের দেশের জনগণের স্বদেশে তৈরি শিল্পজাতদ্রব্য কেনার পরিবর্তে বিদেশী তৈরি জিনিসপত্র কেনার প্রবণতা বেশি। ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি হয় কম এবং এতে করে দেশীয় শিল্পগুলোকে চরম লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। দেশাত্মবোধের অভাবে জনগণ দেশীয় শিল্পের বিকাশে সহযোগিতা করেছে না।

১২. **জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে উচ্চাভিলাষী ও হিতৈষী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বরাবরই অল্পে তুষ্ট থেকেছে বা তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে। মোটা ভাত মোটা কাপড় এবং মাথা গুঁজবার ঠাই হলেই তারা পরিতুষ্ট। এর চেয়ে বেশি কিছু পাবার তেমন প্রয়োজন বোধই জাগেনি। ইদানীং বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে যদিও অনেকেই জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে উচ্চাভিলাষী মনের পরিচয় দিচ্ছে, তথাপি তাদের অনেকেই কেবল ভোগ বিলাসী জীবনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। আরো অধিক মুনাফার আশায় তথা দেশের অর্থনেতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চাইছে। আরো অধিক মুনাফার আশায় তথা দেশের অর্থনৈতিক মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। আরো অধিক মুনাফার আশায় তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হিতৈষী মনে তারা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে নারাজ। তারা নানা কারণে এটাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ মনে করে। বিনা ঝুঁকিতে সহজে রাতারাতি অধিক সম্পদশালী হবার বাসনা ও মনমানসিকতার কারণে দেশে একটি স্থায়ী শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে উঠতে পারছে না।

**প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় :** বাংলাদেশে শিল্পায়নের পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ইতিধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত ঐ সব প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে পারলেই বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রচতগতিতে এগিয়ে যাবে এবং দেশ শিল্পায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

নিচে এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরনের উপায়সমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. **অবকাঠামো উন্নয়ন :** বাংলাদেশ সফর শেষে একজন বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশের শিল্পায়ন বিকাশের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে দুর্বল অবকাঠামো। যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

২. **ঋণখেলাপি সংস্কৃতি রোধ :** ঋণখেলাপিরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান শত্রচ। খেলাপি ঋণ গ্রহীতারা নানা প্রবাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে বিনিয়োগের নামে শত শত কোটি টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না করে অন্য অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। এই খেলাপি ঋণের হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হলে উক্ত টাকা পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে জাতয়ি অর্থনীতি লাভবান হতো। কিন্তু ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে দেশ সমৃদ্ধির সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের স্বার্থে এই ঋণখেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করা অতীব জরুরি।

৩. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বাংলাদেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রবার্ট শোলো প্রমাণ করেছেন যে, দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে পূঁজি ও শ্রমের অবদানের তুলনায় প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের অবদান অনেক বেশি। পুঁজি ও শ্রমের বর্ধিত দক্ষতার সাথে প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ না থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশকে শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৪. **স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন :** সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ মানুষের মতে, বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থার অভাবে প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে দুর্নীতি। তাই শিল্পায়নের স্বার্থে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** শিল্পায়নের জন্য দেশে একটি গণতান্ত্রিক তথা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন উন্নয়নের জন্য একটি যৌক্তিক রাজনৈতিক দর্শনের।

৬. **নীতি নির্ধারণ ও নীতি প্রণয়ন :** সরকারি নীতি নির্ধারণ ও নীতি প্রণয়নের এমন রাজনৈতিক র্দশনের প্রয়োজন যাতে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী হন।

৭. **বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি :** মূলধন গঠনে উদ্বুদ্ধ করা এবং যাদের প্রয়োজনীয় মূলধন রয়েছে তারা যাতে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে শিল্প-কারখানায় অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হতে পারে, তেমন একটি অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা :** আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেক সময় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অতিরিক্ত অনেক সময় লেগে যায়। ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায় বহুগুণ। তাই শিল্প স্থাপনের উপাদান সহজলভ্য করার জন্য আমরাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

৯. **দেশাত্মবোধ সৃষ্টি :** দেশাত্মাবোধ সৃষ্টির জন্য দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিদেশী পণ্য বজন্য করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে জনমত গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত স্বদেশী শিল্পের বিকাশের জন্য চাই ত্যাগ স্বীকার এবং প্রকৃত দেশপ্রেম। আমরা যদি বাইরের জিনিস ব্যবহার একবারে বাদ দিতে পারি, তাহলে দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের মান ক্রমেই প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক নিয়মে উন্নত হবে এবং বিদেশী দ্রব্যের প্রতি মোহ পরিত্যাগ করাও সহজ হবে।

১০. **উন্নত জীবনযাত্রা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি :** সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার মতো একটা সদিচ্ছা তথা অভিলাষ সৃষ্টি করতে হবে এবং ঐ সদিচ্ছা পূরণের জন্য দেশকে যে শিল্পায়িত করতে হবে এটার গুরুত্ব অনুধাবন করার ব্যবস্থাও করতে হবে।

১১. **কাঁচামাল সহজলভ্যকরণ:** শিল্পায়নের স্বার্থে কাঁচামালের সহজলভ্যতা সৃষ্টিতে প্রয়োজনবোধে সরকারকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে অজস্র সমস্যা। এদিকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনীতি মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করায় বাংলাদেশকেও শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য উপরোক্ত সম্ভাব্য করণীয়সমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির সংহতিকরণের মাধ্যমে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থ-সহায়তা/ঋণ প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগ পরিচালনা করে থাকে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য নতুন Country Partnership Framework (CPF 2016-2020) প্রণয়ন করেছে এবং একই সঙ্গে CPF এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ÔSystematic Country Diagnostic (SCD) Report' প্রস্তুত করেছে। CPF-এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পাঁচটি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা বৃদ্ধি করা। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে:

- Energy sector
- Inland connectivity and logistics
- Regional and global integration
- Urbanization
- Adaptive delta management

এছাড়া টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক macro-economic stability and related cross-cutting challenges; human development Ges institutions and business environment পরিচালনায় ক্রমান্বয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। ১৯৭২ সাল হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)) বাংলাদেশে'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমে ২৮.৮৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ/অনুদান প্রদান করেছে। তন্মধ্যে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৯.৭৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করেছে। বর্তমানে ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমে বিশ্বব্যাংকের অর্থ-ছাড়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের সাথে মোট ২.৯৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা স্বাধীনতার পর কোন অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের সাথে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট। অনুরুপভাবে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক হতে ১.৪২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করা হয়েছে যা অদ্যাবধি কোন অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্পের অনুকূলে সর্বোচ্চ বেশি অর্থ ছাড়। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে মোট বৈদেশিক সহয়তার প্রায় ২৯% বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। নিচে বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

**১। Bangladesh Municipal Water Supply and Sanitation Project (BMWSSP) Gi Project Preparation Advance (PPA)**

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Bangladesh Municipal Water Supply and Sanitation Project (BMWSSP) শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রিম (PPA) এর জন্য ঋণচুক্তি গত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। চচঅ এর আওতায় বিশ্বব্যাংক হতে উল্লিখিত প্রকল্পের অনুকূলে ১.২৫ (এক দশমিক দুই পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া যায় যার মাধ্যমে মূল প্রকল্পের জন্য কারিগরি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক BMWSSP বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত পৌরসভাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃব্যবস্থা স্থাপন এবং পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা, বেসরকারী সংস্থা ও জনগণের সম্পৃক্ততায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং বর্তমান পয়ঃব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ পয়ঃব্যবস্থা প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পৌরসভাসমূহ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**২। Additional Financing for Chittagong Water Supply and Sanitation Project (CWSISP)**

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Additional Financing for Chittagong Water Supply and Sanitation Project (CWSISP) শীর্ষক Financing Agreement গত ০৬ আগষ্ট ২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটিতে বিশ্বব্যাংকের প্রাথমিক অর্থ সাহায্য ছিল ১১২.৫০ মিলিয়ন SDR সমতুল্য ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরবর্তীতে প্রকল্প পুনর্গঠন ও SDR বিনিময় হারজনিত মূল্য হ্রাসের কারণে ১৪৪.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে হ্রাস পায়। বর্তমানে প্রকল্পটির কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষতঃ ২০৩০ সনের পরিবর্তে ২০৩৫ সন পর্যন্ত পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হওয়ায়, অতিরিক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে ৪৭.৪৯ (সাতচল্লিশ দশমিক চার নয়) মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৩৪.৭ মিলিয়ন SDR সহজ শর্তের নমনীয় ঋণ অতিরিক্ত অর্থায়ন (Additional Financing) প্রদান করবে।

**৩। Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement (DIMAPP) Project**

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement (DIMAPP) Project শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৯ আগষ্ট ২০১৭ তারিখ ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ডিজিটাল মনিটরিং এবং প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত ই-জিপি মাধ্যমকে আরো শক্তিশালী করা এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি পদ্ধতির অধীনে আনয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement (DIMAPP) Project" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পে ৪০.২০ (চল্লিশ দশমিক দুই শূন্য) মিলিয়ন SDR সমতুল্য ৫৫ (পঞ্চান্ন) মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-কে পুন:গঠন করে কর্তৃপক্ষতে রূপান্তরিত করা এবং ই-জিপি সিস্টেমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা হবে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি পদ্ধতির আওতায় আনা; সরকারি কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্রয় কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে শক্তিশালী করা হবে।

**৪। Dhaka Sanitation Improvement Project (DSIP)**

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Dhaka Sanitation Improvement Project (DSIP) শীর্ষক প্রকল্পটির ৪ (চার) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প প্রণয়ন অগ্রিম (PPA) গত ২৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে: i) Rehabilitation of the Eastern Trunk Main; (ii) Rehabilitation of the Western Trunk Main; (iii) Rehabilitation of the existing Pagla Sewerage Treatment Plan (STP); (iv) Expansion of the Pagla STP; and (v) Construction of Pagla Sewer Network. মূল প্রকল্পটিতে আনুমানিক ৯৭০ (নয়শত সত্তর) মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রকল্পটি কয়েকটি ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।

**৫। National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support Project**

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support Project শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পটি গত ২৮ জুন ২০১৮ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। NSDS-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্বব্যাংকের আইডিএ হতে ১০.৩০ (দশ দশমিক তিন শূন্য) মিলিয়ন ঝউজ সমতুল্য ১৫ (পনের) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করেছে। প্রকল্পের আওতায় সঠিক, নির্ভরযোগ্য, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান (core) জরিপসহ অন্যান্য পরিসংখ্যানগত কার্যক্রমের পরিচালনা পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক যুগোপযোগী করা; যথাসময়ে তথ্য বা রিপোর্ট প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ থেকে রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত সামগ্রিক প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি Comprehensive ICT পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; সর্বাধিক পরিসংখ্যান প্রস্তুতের লক্ষ্যে জরিপের পরিবর্তে 'প্রশাসনিক উৎস' থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তরের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন।

**৬। Bangladesh Power System Security and Efficiency Improvement Project**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুৎ-এর চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সাথে গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন এবং দক্ষতা ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ২৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে Bangladesh Power System Security and Efficiency Improvement Project নামক প্রকল্পে ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের লক্ষে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব Qimiao Fan ঋণচুক্তি টি স্বাক্ষর করেন।

**৭। Bangladesh Regional Connectivity Project-1**

বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রগতিকে সহায়তা করার জন্য বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে Bangladesh Regional Connectivity Project-1 নামক প্রকল্পে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের লক্ষে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব Qimiao Fan ঋণচুক্তি টি স্বাক্ষর করেন।

**৮। Enhancement and Strengthening of Power Transmission Networking Eastern Region Project**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রাখা ও ব্যবসা সহজীকরণের নিমিত্ত নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। এর সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের উন্নয়নে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে Enhancement and Strengthening of Power Transmission Networking Eastern Region নামক প্রকল্পে ৪৫০.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের লক্ষে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব Qimiao Fan ঋণচুক্তি টি স্বাক্ষর করেন।

**৯। Additional Financing II for Rural Electrification and Renewable Energy Development II Project**

গত ৩০ মে, ২০১৮ তারিখে ইডকল কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটির জন্য ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের লক্ষে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব ছরসরধড় ঋধহ ঋণচুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে ইডকল-এর সাফল্যের অনুবৃত্তিক্রমে সোলার ইরিগেশন পাম্প, সোলার মিনি গ্রিড এবং উন্নত চুলা স্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাংক আইডিএ তহবিল থেকে শুধুমাত্র ইডকল-কে দ্বিতীয়বার ৫৫.০০(পঞ্চান্ন) মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য অতিরিক্ত অর্থায়নে ঋণ সহায়তা করা হবে। এতে প্রকল্পের মেয়াদ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

**১০। Investment Promotion & Financing Facility-II Project (IPFF-II)**

গত ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে "Investment Promotion & Financing Facility II Project (IPFF-II)" শীর্ষক প্রকল্পে ৩৫৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইডিএ-এর মধ্যেএকটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিতব্যয় ৪১৬.৭ মিলিয়ন মার্কিনডলার। তন্মধ্যে, বিশ্বব্যাংক Scale-up Facility (SUF) এর তহবিল থেকে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আইডিএ নমনীয় ঋণ থেকে ২৫৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। অবশিষ্ট ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশে সরকার কাউন্টার পার্টফান্ড হিসেবে প্রদান করবে। প্রকল্পটি ৫বছর (জুলাই২০১৭ হতে জুন২০২২) মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**১১। Bangladesh Insurance Sector Development Project**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'Bangladesh Insurance Sector Development Project' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে, বিশ্বব্যাংক (আইডিএ) ৬৫.০০মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহজ শর্তেও নমনীয় ঋণ হিসাবে প্রদান করবে; অবশিষ্ট ১৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ সরকার সহযোগী ফান্ড হিসেবে প্রদান করবে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং বাংলাদেশে ইনস্যুরেন্স পরিধি বৃদ্ধি করা।

**১২। Sustainable Enterprise Project (SEP)**

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন পল্লী কর্মসহায়ক-ফাউন্ডেশন (PKSF) কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য æSustainable Enterprise Project (SEP)" শীর্ষক প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক ও International Development Association (IDA) উইন্ডো থেকে ১১০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণ প্রদান করবে। এলক্ষ্যে গত ৬মে ২০১৮ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যেএকটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে, বিশ্বব্যাংক (IDA) ১১০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহজ শর্তের নমনীয় ঋণ হিসাবে প্রদান করবে; অবশিষ্ট ২০.০০ মিলিয়ন মর্কিন ডলার পল্লী কর্ম সহায়ক সংস্থা (PKSF) প্রদান করবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে পল্লী কর্ম সহায়ক সংস্থা (PKSF) কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে (২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগগুলোতে পরিবেশগত টেকসই পদ্ধতির চর্চা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

**১৩। Financing Support for the 4th HNP Sector Program**

"চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (4 th HPNSP)" শীর্ষক কর্মসূচিতে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ এবং Global Financing Facility হতে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঋণচুক্তি এবং অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব, কাজী শফিকুল আযম এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে বিশ্বব্যাংকের Country Director, Mr. Qimiao Fan উক্ত ঋণ এবং অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল: ক) শাসনকার্য এবং ন্যস্ত দায়িত্ব; খ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; গ) গুণগতস্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং ঘ) জনসংখ্যা সংক্রান্ত সেবার বিধান করা।

**১৪। Export Competitiveness for Jobs Project**

Export Competitiveness for Jobs Project শীর্ষক প্রকল্পের-এর উপর গত ০৫-১১-২০১৭ তারিখে বিশ্বব্যাংকের সাথে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা সামগ্রী প্রস্তুত; হালকা প্রকৌশল (ইলেক্ট্রনিক্স ও যন্ত্রপাতি) তৈরী এবং প্লাষ্টিক খাতের রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**১৫। Additional Financing for æ Safety Net Systems for the Poorest (SNSP) Project**

Safety Net Systems for the Poorest (SNSP)" শীর্ষক প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীতে টিএপিপি সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্প এবং ঋণচুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত ২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত ঋণচুক্তি ০৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। দারিদ্র দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে ৫টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচিসমূহ হল অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি Employment Generation Programme for the Poorest (EGPP), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (টিআর), গ্রান্ট রিলিফ (জিআর) এবং Vulnerable Group Feeding (VGF)। বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে এলাকা নির্বাচন, সুফলভোগী নির্বাচন,অপচয়রোধ, পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় Safety Net Systems for the Poorest (SNSP) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

**১৬। Livestock Development-based Dairy Revolution and Meat Productions (DRMP)**

"Livestock Development-based Dairy Revolution and Meat Productions (DRMP)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা (DPP) প্রণয়ন সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন অগ্রিম (PPA) হিসাবে ১.২ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার অগ্রিম প্রদানে বিশ্বব্যাংকের আইডিএ সম্মত হয়েছে। এ সংক্রান্ত চুক্তি ১২ জুলাই, ২০১৭ এবং ১৩ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

**১৭। Sustainable Forests & Livelihood (SUFAL)**

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Sustainable Forests & Livelihood (SUFAL)-শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুকূলে Project Preparation Advance হিসেবে ১.০০মিঃ ইউএস ডলার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিজ্ মাহমুদা বেগম কর্তৃক Project Preparation Advance Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

**১৮। Fourth Primary Education Development Program (PEDP4)**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর "Fourth Primary Education Development Program (PEDP4)" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে বিশ্বব্যাংক ৭০০ (সাতশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করেন। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে গত ২৮ জুন, ২০১৮ তারিখ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী শফিকুল আযম এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে Country Director, Mr. Qimiao Fan উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কর্মসূচিটি জুলাই ২০১৮/১৯-২০২২/২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মার্কিন ডলার ১৮.৫ বিলিয়নের বাজেট সংস্থান আছে এবং বিশ্বব্যাংকের International Development Association (IDA) ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (SDR ৪৮৪,২০০,০০০ বা ৫৮০৭.২০ কোটি টাকা) প্রদানে সম্মত হয়েছে। এছাড়া, এডিবিসহ অন্যান্য ১০টি উন্নয়ন সহযোগী আরো ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে সম্মত হয়েছে। PEDP-4 কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল: ক) গুণগত teaching learning চর্চার মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম সফল ও দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করা; খ) সকল শিশুর জন্য শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে করে সকল শিশু সমভাবে গুণগত ও নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে; এবং গ) শক্তিশালী পরিচালনা, পর্যাপ্ত ও ন্যায়সঙ্গত অর্থায়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির মানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা যা মূলত দক্ষ, সর্বব্যাপি ও ন্যায়সংগত শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হবে।

CLASS WORK বাংলাদেশ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এডিবি অনুবিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প/ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর ঋণ ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এডিবি'র অর্থায়নে দেশে/বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি/কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে ।

এডিবির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য দেশসমূহকে দরিদ্রমুক্ত করা এবং এ অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন। এটি বাংলদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩ সালে সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এ সংস্থা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এশীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে রেয়াতি সুবিধায় সর্বাধিক ঋণগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ২২ আগস্ট ০১ লক্ষ শেয়ার ও ৩১টি সদস্য দেশ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে মোট সদস্য সংখ্যা ৬৭। তার মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্যদেশ ৪৮টি। এডিবিতে বাংলাদেশের শেয়ার সংখ্যা ১০৮৩৮৪ যা মোট শেয়ারের ১.০২১%। ভোটের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের ভোট ১.১১৫%।

এডিবি বাংলাদেশকে দুই ধরনের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে- একটি ঋণ ও অপরটি অনুদান। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এডিবি Asian Development Fund (ADF) হতে সহজ শর্তে এবং Ordinary Capital Resources (OCR) হতে London Inter Bank Offerced Rate (LIBOR) ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করত। ঋণ প্রদান সক্ষমতা দরিদ্র দেশে বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৭সালে এডিবি ADF ও OCR উৎসকে একত্রিত করে দরিদ্র দেশসমূহকে সহজ শর্তে OCR ঋণ প্রদান করছে যেটি Ordinary Capital Resources (Concessional) Loan (COL) হিসেবে পরিচিত। COL ঋণের সুদের হার ২% এবং Regular OCR ঋণের সুদের হার London Inter Bank Offeced Rate (LIBOR) ভিত্তিক। এডিবি প্রদত্ত ঋণ ০৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৫ বছরে পরিশোধযোগ্য। এডিবি থেকে ঋণ গ্রহণকারী দেশসমূহ Gross National Income (GNI) Per Capita এবং Credit Worthiness এর ভিত্তিতে তিন গ্রুপে বিভক্ত:

- ☯ Group A (Concessional Assistance Only)
- ☯ Group B (OCR Blend)
- ☯ Group C (Regular OCR Only)

২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এডিবি'র বি-গ্রুপভূক্ত দেশ হিসেবে গণ্য।

এডিবি তার সদস্য দেশসমূহের চাহিদা মোতাবেক ঋণ/অনুদান প্রদান ছাড়াও Sub-regional Economic Cooperation এর মাধ্যমে একই অঞ্চলে পাশাপাশি অবস্থিত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তথ্য প্রযুক্তি ও আন্তঃবাণিজ্য সহজীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এডিবি এ ধরণের ০৫টি Sub-regional Economic Cooperaton এর মধ্যে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) অন্যতম। বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভারত SASEC এর সদস্য দেশ এবং বাংলাদেশের জন্য পদাধিকারবলে SASEC এর Nodal Official হলেন এ বিভাগের সচিব।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে এডিবি প্রধানত বিদ্যুৎ, জ্বালানি, স্থানীয় সরকার, পরিবহন, কৃষি, শিক্ষা, পানি সম্পদ ও সুশাসন সেক্টরকে প্রাধান্য দেয় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এডিবি অনুবিভাগে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ০৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ০৪টি কারিগরি প্রকল্প এবং ০২টি আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে এডিবি মোট ৭৮০.৬৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করেছে।

## CLASS WORK বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। সমাজ নির্ধারিত সাধারণ জীবন যাত্রার মানের চেয়ে যাদের জীবন যাত্রার মান কম তারাই দরিদ্র এবং এই দরিদ্র অবস্থাকেই দারিদ্র বলে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদত্ত দারিদ্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী "দারিদ্র বলতে জীবনযাত্রার নূন্যতম মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার হতে বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা বোঝায়।" দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রভৃতি মৌল মানবিক চাহিদা পূরনের অক্ষমতাই হচ্ছে দারিদ্র। একটি নূন্যতম পরিমান আয় উপার্জন ছাড়া এ সমস্ত অভাব পূরণ করা যায় না। তাই একটি নূন্যতম পরিমান আয় উপার্জনের অক্ষমতাকেই দারিদ্র্য বলা হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র্য গণনা করা হচ্ছে মূলতঃ দুই ভাবে, প্রথমতঃ দুইটি "দারিদ্র্য রেখা" টাকা হচ্ছেঃ একটি "মোটামুটি দারিদ্র রেখা" ও আর একটি "চরম দারিদ্র রেখা" তারপর এই দুই রেখার নীচে কতজন মানুষ আছে তা গণনা হচ্ছে। দ্বিতীয়ঃ দারিদ্রের সামষ্টিক তীব্রতা মাপাবার জন্য দারিদ্র রেখার কতো নীচে কতজন করে মানুষ আছে তার একটা কম্পোজিট ইনডেক্স নির্মান করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য রেখাটি টানা হচ্ছে গড়পরতা একজন মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা অটুট রাখবার জন্য যে পুষ্টি (ক্যালরি ও আমিষ) প্রয়োজন তা কেনবার খরচ ধরে এবং খাদ্য ছাড়া অন্যান্য "মৌলিক চাহিদা" পূরনের জন্য এর ওপর আরো ৩০% যোগ করে। এ ৩০% যুক্তিটা এইভাবে দেয়া হচ্ছে যে, মোটামুটি দরিদ্র পরিবাররা তাদের মোট খরচের ৭০% এর মতো খাদ্যদ্রব্যের ওপর খরচ করে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের পাশাপাশি কতিপয় বেসরকারি (এন.জি.ও) প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এ সমস্ত এন. জি. ও প্রধানত গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের জন্য আত্ম–কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

### ↘ বাংলাদেশে দারিদ্রতার কারণসমূহ

প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী কাজ পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র এই মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে। ফলশ্রুতিতে দেশের মানুষের প্রতি.ভা বিকশিত হবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনাবিল শান্তি নেমে আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ ও রাষ্ট্র নানাবিধ সমস্যায় ভারাক্রান্ত। যার ফলশ্রুতিতে দেশ ও জনগণ দারিদ্র্যতায় আক্রান্ত। নিম্নে দারিদ্র্যতার কারণসমূহ উল্লেখ করা হল :

১। **ঔপনিবেশিক শোষণ :** তৎকালীন ভারতবর্ষ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল। ইংরেজরা এদেশকে কাঁচামালের উৎস ও নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে কুটির শিল্পগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। ফলে এদেশের মাথাপিছু আয় আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এভাবে ব্রিটেনে সমৃদ্ধির আলো জ্বালাতে গিয়ে এদেশের মানুষ আস্তে আস্তে রিক্ত হয়ে পড়ে।

২। **পাকিস্তান সরকারের অবহেলা :** পাকিস্তানি আমলের ২৪ বছরে পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ বাংলাদেশের জনগণের ভাগোন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের সম্পদ দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করেছে। ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

৩। **শিল্পে অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর। ব্রিটিশ আমলে এদেশে শিল্পোন্নয়ন হয়নি। পাকিস্তান আমলেও এখানে শিল্পোন্নয়নের গতি ছিল মন্থর। স্বাধীনতার পরও অবস্থার তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। ফলে আমাদের জনগণের মাথাপিছু আয় কম ও তারা দরিদ্র।

৪। **অনুন্নত কৃষি :** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪৮ শতাংশ মানুষ কৃষি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও আমাদের কৃষকেরা লাঙল জোয়ালের সাহায্যে চাষাবাদ করে। যান্ত্রিক চাষাবাদ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার খুবই কম। ফলে আমাদের দেশে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ও কৃষকের মাথাপিছু আয় খুবই কম।

৫। **ক্ষেত মজুর :** বাংলাদেশের ৫২% ভূমিহীন পরিবারের বেশীর ভাগ শ্রমিক ক্ষেত মজুর হিসাবে কাজ করে। বর্তমান গড় মজুরী পুরুষদের ১০০-১৫০ টাকার উর্ধ্বে নয়, মহিলাদের মজুরী ৫০-৮০ টাকা। এদিক থেকে দরিদ্র্য কৃষকেরা কি করে জীবন যাপন করে, উত্তরহীন প্রশ্ন থেকে যায়। এছাড়া শাসিত সমাজে মেয়েরা পুরুষদের পরে খেতে বাধ্য হয়। ফলে মেয়েরা আরো শোষিত হয়।

৬। **মজুরী হ্রাস :** স্বাধীনতার পর শ্রমিক শ্রেণীর দৈন্যতা আরো বাড়ছে। মাথাপিছু আয় নামমাত্র অল্প কিছু বেড়েছে। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরী সামান্য বেড়েছে।

৭। **উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘণত্ব :** ২০০৯ সালের জাতিসংঘের হিসেবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। ১৯৯১ সালে ছিল ১০.৪ কোটি। ১৯৮১ সালে ছিল ৮.৯৯ কোটি। ১৯৮১ সালে জনসংখ্যার ঘণত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিচারে ৬২৪ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ১৯৯১ তা ৭৮২ জনে উন্নীত হয়। বর্তমানে ১১০৩ জন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার

১.৩৬%। দেশের মোট জনশক্তির ৩৬% ই হল ১-১৪ বছর বয়সের নীচে ও ৬০ বৎসরের উপরের বয়সের যারা কাজ করে না। যারা আয় সৃষ্টিতে অবদান রাখে না। জনসংখ্যার ঘণত্ব বাড়ার সাথে সাথে জমির উপর চাপ বাড়ছে। বাড়ীর জায়গা, অবকাঠামো ও সরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে মানুষের চাষের জমি ক্রমেই কমছে। ১৯৬০ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.৩৭ একর, ১৯৭৭ সালে ০.২৬ একর, ১৯৮৫ সালে ০.২৫ একর এবং বর্তমানে ০.১৮ একর। ভূমিহীন দিন মজুরদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। একই সাথে দারিদ্রতাও বাড়ছে।

৮। **বেকারত্ব :** ক্রমবর্ধমান বেকারত্বকে দারিদ্রতার নির্ধারক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দেশের বেকারত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দরিদ্রতার প্রকোপ আরো অবনতিশীল করছে। প্রতি বছর ২২ লক্ষ জনসংখ্যা বাড়ছে। একই সময়ে প্রতি বছর নতুন কাজ চাইছে প্রায় ৮ লক্ষ জনবর্ষ। নতুন কর্মসংস্থান দ্বারা শ্রমের চাহিদা বাড়ে ৭০ হাজার লোকের। বাকী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োগ লাভের সুযোগ পায় দু'তিন লক্ষ। এর পর থাকে ৪ লক্ষ জনশক্তি। এরা পূর্ণ বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব নিয়ে অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। মোট জনশক্তির ৩০% বেকার। এরা অন্যের উপর নির্ভর করে।

৯। **ভূমিহীনতা :** ভূমিভিত্তিক অর্থনীতিতে ভূমিহীনতার সাথে দারিদ্রতার একটি ঘণিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। এ দেশের ভূমিহীনরাই চরমভাবে দরিদ্র। ১৯৬০ সালে ভূমিহীনতা ছিল ২৮ ভাগ, ১৯৬৮ সালে ছিল ৩১ ভাগ, ১৯৮১ সালে ছিল ৫২ ভাগ এবং বর্তমানে এই হারে ৫৮ বলে কেউ কেউ অনুমান করছেন। তা হলে দারিদ্রতার চরম সীমার নীচে পৌঁছানোর সাথে ভূমিহীনতার ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

১০। **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত। বেকারত্বের জন্য বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তির অপচয় হচ্ছে। এর ফলে দেশে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় কমে যাচ্ছে।

১১। **কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** কারিগরি শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। কুশলি শ্রমিকের অভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

১২। **দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি :** বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বাংলাদেশের জনজীবন দূর্বিসহ করে তুলেছে এবং জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১৩। **নৈসর্গিক বিপর্যয় :** আমাদের দারিদ্র্যের পিছনে প্রকৃতির ভূমিকাও কম নয়। বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু বন্যা , খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে প্রতি বছর আমাদের বিপুল পরিমাণ শস্যের ক্ষতি হয়।

১৪। **নারী শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশের শ্রমশক্তির অর্ধেক মহিলা। কিন্তু শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে এদেশের অধিকাংশ মহিলার কর্মজীবন সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকে। ঘরের বাইরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের কোন ভূমিকা নেই। ফলে এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশী এবং দেশটি দরিদ্র।

১৫। **সম্পদের অসম বন্টন :** আমাদের দেশে সম্পদের বন্টন ব্যবস্থাও সুষম নয়। বাংলাদেশের সম্পদের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

১৬। **সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা :** আমাদের দেশে এখনও উন্নত দেশের অনুরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়নি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মানুষ এখনও সমাজ সচেতন নয়। দেশ থেকে দূর্নীতি দূর হয়নি। হরতাল, ধর্মঘট, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি কারণে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য এদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

১৭। **দূর্বল অবকাঠামো :** বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। মূলধন এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবে এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি এখনো সুদৃঢ় কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দূর্বল অবকাঠামোর কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। যার কারণে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটছে না।

১৮। **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যৌক্তিক ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে প্রাচুর্যের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম।

### ➘ বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে সমাজদেহ থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করতে হলে আমাদেরকে উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। **কৃষি উন্নয়ন :** কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কাজেই কৃষি উন্নয়নে আমাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পুরাতন পদ্ধতির চাষাবাদ পরিহার করে কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য দূর হবে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

২। **শিল্পোন্নয়ন :** অতীতের সকল ব্যর্থতা মুছে ফেলে শিল্পোন্নয়নের জন্য আমাদেরকে একটি সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৩। **জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ :** আমাদের দেশে বর্তমানে যে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা রোধ করতে না পারলে উন্নয়নের সকল পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে। সুতরাং দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা সুষ্ঠূ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উত্তাল তরঙ্গকে অবশ্যই রোধ করতে হবে। পাশাপাশি গ্রামে গঞ্জে নারী–পুরুষদের প্রাথমিক মৌলিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মূলত নারীর ক্ষমতায়ন, কুসংস্কারমুক্ত ও সমাজসচেতন দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

৪। **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার :** দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিন্ত করতে হবে। দেশে কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন এবং প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানি করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

৫। **শিক্ষা বিস্তার :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত অপরিহার্য।

৬। **কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :** শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের দারিদ্র্য দূর করতে হলে দেশে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে।

৭। **মূলধন গঠন :** মূলধনের অভাবে আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং দেশে মূলধন গঠণের হার বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। **বেকার সমস্যার সমাধান :** বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত। এদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে বেকার সমস্যার আশু সমাধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও হাল্কা শিল্পের ব্যবস্থা করে গ্রামের বেকার লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করা যেতে পারে।

৯। **মহিলা সমাজের উন্নয়ন :** দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হল মহিলা। সুতরাং মহিলাদের অবস্থার উন্নতি না করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়া এবং বিবাহ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি প্রশ্নে প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন ও মহিলাদের জন্য আলাদা সমবায় আন্দোলনের উপর জোর দিতে হবে।

১০। **পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিবহন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

১১। **সুষ্ঠু পরিকল্পনা :** জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে হলে আমাদেরকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়েছে। বর্তমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে আমাদের অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হবে।

১২। **সামাজিক ও ধর্মীয় গোড়ামি :** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সকল প্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করতে হবে।

১৩। **সুষ্ঠু ভূমি সংস্কার নীতি প্রণয়ন :** কৃষি বাংলাদেশের জনগণের প্রধান উপজীবিকা। সুতরাং এদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমির মালিকানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এ সমস্ত ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু ভূমি সংস্কার নীতি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

১৪। **অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন :** একটি উন্নয়ন উপযোগী আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উপস্থিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সফল করতে হলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক।

১৫। **বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ :** জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয়-বৃদ্ধি করা যায়। অতএব, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে আমদানি হ্রাস করতে হবে। বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে দেশে রপ্তানীমুখী শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১৬। **সম্পদের সুষম বন্টন :** সম্পদের সুষম বন্টন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং দেশের সম্পদ যাতে কতিপয় মানুষের নিকট পুঞ্জীভূত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১৭। **ক্ষেত মজুরদের সুযোগ বাড়াতে হবে :** শুধুমাত্র কৃষি খামারের কাজে সীমাবদ্ধ না রেখে এসব শ্রমিকের শিল্পখাতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে কৃষির মজুরী কাঠামো ও কাজের শর্ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন রয়েছে । এছাড়া কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের মূল্য যথোপযুক্ত করতে হবে।

১৮। **মজুরী পরিবর্তন :** দেশে বর্তমান প্রায় ১০% মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। তাই প্রতিবছর মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির হার ৮% এর বেশী করতে হবে অথবা মজুরীর হার বাড়াতে হবে। যাতে শ্রমিক ও কর্মচারীরা সহজে জীবন যাপন করতে পারে।

১৯। **পরিকল্পিত উন্নয়ন :** এই চরম দারিদ্র্যতা হ্রাসের জন্য একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যে পরিকল্পনায় দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে।

২০। **দেশী বিদেশী সংস্থা :** দারিদ্র্যতা দূরীকরণে দেশী বিদেশী সংস্থাসমূহকে সমন্বয় করতে হবে এবং উন্নয়ন কাজে তাদের কর্মকান্ড তদারকি করতে হবে।

২১। **লক্ষ্যজনগোষ্ঠীর উন্নয়ন :** বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য চাষ, বনায়ন, হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি পালন, ব্যবসা এসব ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়াতে হবে। এজন্য লক্ষ্যজনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

২২। **আঞ্চলিক অসমতা :** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল সবদিক দিয়েই অবহেলিত। যেখানে মাথাপিছু আয় কম, উৎপাদনশীলতা কম, বেকারত্ব বেশী, শিক্ষিতের হার কম, মৃত্যুহার বেশী, জন্ম হারও বেশী, মজুরী কম, বাণিজ্য শর্তে প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের এরূপ বৈষম্য দূরীকরণে সুষম উন্নয়ননীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। যা এ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

### ➘ দরিদ্র্য বিমোচনে বিশ্ব ব্যাংকের কৌশলসমূহ

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তিনটি কৌশল উদ্ভাবন করে।

ক) সুযোগ বাড়ানো

খ) ক্ষমতায়ন এবং

গ) নিরাপত্তা জোরদারকরণ

**ক) সুযোগ বাড়ানো:** সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দরিদ্রদের অংশ বাড়ানো, সম্পদের অধিকার বাড়ানো এবং সম্পদের উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান মাত্রা সৃষ্টি করা। সম্পদের উপর অধিকার অর্থ-

- ✓ প্রাকৃতিক সম্পদ তথা জমিতে অধিকার
- ✓ মানবীয় সম্পদ -শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অধিকার
- ✓ আর্থিক সম্পদ তথা ঋণ গ্রহণের সুযোগদান
- ✓ সামাজিক সম্পদ ও নেট ওয়ার্কিং এর সুযোগ।

এই সুযোগগুলো সরকার দিতে পারে এবং এজন্য প্রয়োজন হল–

- ✓ সম্পদ পূন:বন্টন দ্বারা
- ✓ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করা

- ✓ জমি ও ঋণ পেতে পারে, এর সুযোগ সৃষ্টি করা।

একটি স্থবির অর্থনীতিতে দারিদ্র্য নিরসন হয় না। প্রবৃদ্ধির হার ১% হলেও দারিদ্রতা ২% কমতে পারে। আবার একই প্রবৃদ্ধির হারে কোন দেশে দারিদ্র্য নিরসন বেশি হয়, কোন দেশে কম হয় । বিশ্ব ব্যাংকের গবেষক (Dollar and Krany) ৮০টি দেশের ৪০ বৎসরের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে দেখান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধনী ও দরিদ্র্য উভয়ের অবস্থাই ভালো করে।

**খ) ক্ষমতায়ন :** দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়া, সাম্প্রদায়িক বা উপজাতীয়, ধর্মীয়, পুরুষ-মহিলা বৈষম্য হ্রাস করা এবং রাষ্ট্র হবে অবশ্যই দরিদ্রের কাছে জবাবদিহিতামূলক এবং দায়িত্বশীল। রাষ্ট্র দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে যে কাজগুলো করবে-

- ✓ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দরিদ্রদের অধিকার গ্রহণে দূর্নীতি ও হয়রানি বন্ধ করবে
- ✓ দরিদ্রদের আইনি সহায়তা দেয়ার সুযোগ থাকবে এবং Good Governance থাকবে।
- ✓ স্থানীয় সেবাসমূহ এলাকার উচ্চবিত্তদের দ্বারা যেন করায়ত্ত্ব না হয়।
- ✓ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দারিদ্রদের অংশগ্রহণে উৎসাহিতরণ।
- ✓ দরিদ্রের বিরুদ্ধে সরকারী সমর্থন মূলক কার্যক্রম থাকবে।

**গ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার :** দরিদ্রদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অর্থনৈতিক দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শস্যহানি, ভগ্নস্বাস্থ্য, সন্ত্রাস, দাঙ্গা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার দরিদ্রদের সহায়তা করবে। দু:স্থদের জন্য সাহায্য বীমা, বার্ধক্য বীমা, বেকারত্ব বীমা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, সামাজিক ফান্ড, নগদ অর্থ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, শস্য বীমা এবং পণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে দরিদ্রদের রক্ষা করতে হবে। আন্তর্জাতিক কার্যক্রমও হিসেবে থাকতে হবে-

- ✓ বিশ্বকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করা।
- ✓ দরিদ্র দেশের বাজার উন্নত দেশে তুলে ধরা
- ✓ বিশ্বমানের দ্রব্য সরবরাহ বাড়ানো। দুর্যোগ মোকাবেলা, কৃষি ও শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞানের বিতরণ করা।
- ✓ বেশী করে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ দান।
- ✓ আই.এম. এফ, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কর্মকান্ডে দরিদ্র দেশের কথা বলার বেশী সুযোগ দান করতে হবে।

এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর মতে নীতি গ্রহণে অর্থায়নকে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

### ➘ বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহ

বর্তমান কালে অর্থনীতিবিদগণ শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে রাজি নন। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি এর সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেকের মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধি পায় তবেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য সীমার নীচে রেখে শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায় না। অতএব, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে সঠিক দারিদ্র্য বিমোচনকারী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা দরকার।

**দারিদ্র্য বিমোচনকারী উন্নয়ন কৌশল :** দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বলতে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে সঠিক পদ্ধতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করাকে বোঝায়। দারিদ্র্য কর্মসূচীকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (ক) প্রত্যক্ষ কর্মসূচী, (খ) পরোক্ষ কর্মসূচী।

**ক) প্রত্যক্ষ কর্মসূচী :** দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যক্ষ কর্মসূচী বলতে লক্ষ্যদল ভিত্তিক আয় বর্ধনকারী কর্মসূচী গ্রহণ করাকে বোঝায়। প্রবৃদ্ধি হলেই দারিদ্র্য নিরসন হয় না। কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফসল অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ধনীরাই তুলে নেয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী তিমিরেই থেকে যায়। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'নিরাপত্তা বেষ্টনী' (ঝধভব; ঈড়ৎফড়হ) বিস্তার করা প্রয়োজন হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এরূপ নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তার করা প্রত্যক্ষ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য। দেশের দরিদ্র জনগণের জন্য

আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের জন্য ভাতা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যক্ষ কৌশলের অন্তর্গত। চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে অনাহার থেকে বাঁচানো এবং তাদের আয় বর্ধনকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেস্ট রিলিফ (Test Relief), ভিজিডি (Vulnerable Group Develoment), জি আর (Gratuitious Relief), ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) ইত্যাদি নিরাপত্তা বেষ্টনী গ্রহণ করে থাকে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী খাতে ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

**খ) পরোক্ষ কর্মসূচী :** দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কর্মসূচীকে দারিদ্র্য বিমোচনের পরোক্ষ কর্মসূচী বলে। যেমন- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশী হলে দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে দারিদ্র্য লাঘব হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের সংখ্যা ০.৯ শতাংশ হ্রাস পায়। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। তদুপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক অককাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের যোগ্যতা বাড়ে। দারিদ্র্য বিমোচনের পরোক্ষ কর্মসূচী হিসেবে বাংলাদেশে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

### ➘ দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (পি. আর. এস.পি.)

দেশের উন্নয়নের ধারা সুসংহত করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে দারিদ্র বিমোচন করাই ছিল এ পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম লক্ষ্য। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশে আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমান সরকার অন্তত: ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্নভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল সময়োপযোগী করে দ্বিতীয় বারের মত সংশোধন (দিন বদলের পদক্ষেপ: দ্রুত দারিদ্র নিরসনের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (২০০৯-২০১১) করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে বর্তমানে ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়নাধীন আছে, যা খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়াও দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন ঘটবে প্রণয়নাধীন এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)। এ রূপকল্প রূপায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এ দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের আলোকে, মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে সরকার যে ৫টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণ অন্যতম। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রভূত সাফল্য লাভ করছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে।